শিশুরঞ্জন

ভারত-ইতিহাস।

(অতি প্রাচীন কাল হইতে রাজরাজেশ্বরী
ভিক্টোরিয়ার জুবিলি পর্য্যন্ত।)

শ্রীদামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

তৃতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১২৯৫।

Printed and Published by H. M. Mookerjea & Co.
at the New Sanskrit Press.
6, Balaram Dey's Street.
Calcutta

বিজ্ঞাপন।

শিশুগণের পাঠোপযোগী কোন ভারত-ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় নাই। বাঙ্গলা ভাষায় আমাদের দেশের যে সকল ইতিহাস গ্রন্থ দেখা যায় সে সকলই উচ্চতর শ্রেণীর উপযোগী। বঙ্গদেশের প্রায় সকল বিভাগেই ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার একতম অবশ্যপাঠ্য পুস্তক। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ উক্ত শ্রেণীতে আরোহণ করিয়া রাশি রাশি পুস্তকের গুরুভারে নিতান্ত অবনত হইয়া পড়ে এবং, শিশুকালে নিম্ন শ্রেণীতে ইতিহাসের বিন্দু বিসর্গও শিক্ষা না হওয়ায়, বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ হস্তে উপস্থিত হইলে তাহা নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস বলিয়া জ্ঞান করে। ইতিহাস অতি বাল্য-কাল হইতেই পঠিত হওয়া উচিত এবং স্বদেশের ইতিহাসের প্রতি অশ্রদ্ধাবান হওয়া সকলের পক্ষেই নিতান্ত অকল্যাণকর। শিশুকাল হইতে স্বদেশের সরল ইতিহাস পাঠ করিতে পাইলে ছাত্রগণ তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে ও তৎসংক্রান্ত বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠকালে তাহারা হতাশ বা অবসন্ন হইবে না, এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া 'শিশু-রঞ্জন ভারত-ইতিহাস' প্রচার করা হইল।

ইংরাজদিগের মধ্যে শিশুকাল হইতেই ইতিহাস শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে এবং তাঁহাদের দেশে স্যর ওয়াল্‌টার স্কট, চার্লস্‌ ডিকেন্স প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় উপন্যাস-লেখকগণ শিশু শিক্ষার্থ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ফলতঃ ইতিহাস যদি জাতীয় কীর্ত্তি বা কলঙ্কের নিদর্শন হয়, তাহা হইলে অতি শৈশব কাল হইতেই তাহা হৃদয়পটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক।

ডিকেন্সের ইয়ং চাইল্‌ডস্‌ হিষ্টরি, এবং স্কটের টেল্‌স্‌ অভ্‌ এ গ্রাণ্ডফাদার প্রভৃতি পুস্তকের প্রণালীর অনুসরণে, অতি সরল ভাষায় ও গল্পচ্ছলে, এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি লিখিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। উপর্য্যুপরি জটিল ঘটনাবলীর বিন্যাস বা বারম্বার কাল নির্দ্দেশ করিয়া এ গ্রন্থকে শিশুগণের পক্ষে নীরস ও অরুচিকর করা হয় নাই। যে

যে ব্যাপারের মূল ঔপন্যাসিক উপাদানে সংগঠিত উক্তস্থল আখ্যানাকারে বিস্তৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। ভারত-ইতিহাসের বহিরাবরণ মাত্র ইহাতে বিনিবেশিত হইযাছে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সযত্নে পরিত্যাগ করা গিয়াছে।

ইতিহাসের যে যে স্থল প্রতিবাদার্হ বা সন্দেহ সমাকুলিত, এ পুস্তকে সে সে স্থলের অবতারণা করা হয় নাই। হিন্দু রাজত্বকালের বিশদ ঐতিহাসিক বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয নাই, কখনও হইবে কি না সন্দেহ। তৎসাময়িক অধিকাংশ কথাই অদ্যাপি পণ্ডিতগণের বিচার্য্য রহিয়াছে। তাদৃশ প্রসঙ্গের অবতারণা এরূপ শিশুপাঠ্য পুস্তকের লক্ষিত নহে, এজন্য সেই সময়ের কয়েকটী স্থূল ও অবিসম্বাদিত কথা মাত্র ইহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে। পুস্তকের শোভা সম্বর্দ্ধন ও শিশুগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে ইহাতে কয়েকখানি চিত্র যোগ করা হইয়াছে।

শ্রীদামোদর শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

চিত্র ঃ—

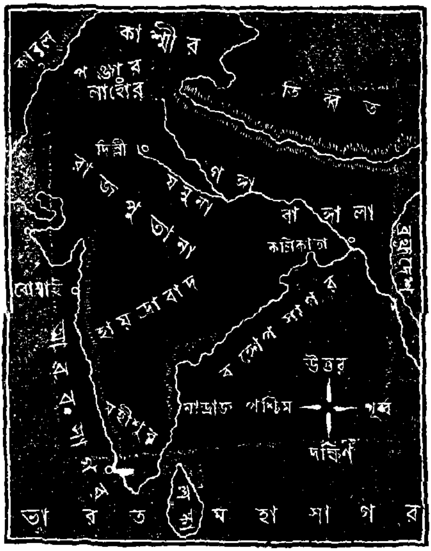
শিশুরঞ্জন

ভারত-ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়—উপক্রমণিকা।

ইতিহাস।—বল দেখি শিশুগণ, তোমরা কিসের গল্প শুনিতে ভাল বাস? আমি এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প জানি যে, তোমরা সে সব শুনিলে বড়ই সন্তুষ্ট হইবে। রাজা, রাণী, যুদ্ধ প্রভৃতির কতই গল্প তোমরা ঠাকুর-মা, দিদি-মা, বা পিসি-মার নিকটে হয়ত শুনিয়া থাকিবে, কিন্তু সে সকল প্রায়ই মিথ্যা গল্প এবং তাহা না জানিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। আমি তোমাদিগকে আজি যে সকল রাজা, রাণী, যুদ্ধ ইত্যাদির আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প শুনাইতে আরম্ভ করিতেছি তাহা প্রায়ই সত্য এবং তাহা জানা তোমাদের নিতান্ত আবশ্যক। আমি তোমাদের নিকট একটা দেশের রাজা, প্রজা, মন্ত্রী, যুদ্ধ ইত্যাদির অনেক গল্প বলিব স্থির করিয়াছি। এইরূপ গল্পের নাম ইতিহাস। আমরা যে দেশে বাস করি তাহার নাম কি বল দেখি? তাহার নাম ভারতবর্ষ। আমি আজি তোমাদের নিকট

আমাদের এই ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করি-তেছি। ইতিহাস জানায় অনেক উপকার এবং, সকল লোকেরই, আর কিছু হউক না হউক, নিজের দেশের ইতিহাস জানা বড়ই আবশ্যক।



ভারতবর্ষ।—ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয় নামে অতি উচ্চ এক পর্ব্বত আছে; পশ্চিম দিকে আফ্-গানিস্থান নামে এক দেশ ও আরব সাগর নামে এক সমুদ্র আছে, দক্ষিণ দিকে ভারতমহাসাগর নামে এক বড় সমুদ্র

আছে; এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর নামে সমুদ্র ও পূর্ব্ব উপদ্বীপ নামে এক দেশ আছে। ভারতবর্ষের আকার কেমন তাহা পূর্ব্ব পত্রে আঁকিয়া দেওয়া হইল।

পরিমাণ ও লোকসংখ্যা।—কাগজে ছোট ছাপা দেখিয়া তোমরা মনে করিতেছ বুঝি ইহাতে আমাদের হাত খানিই ধরে না, আমরা এমন দেশে কেমন করিয়া থাকি! কিন্তু তা নয়—ভারতবর্ষ খুব বড় দেশ। এক ক্রোশ কত পথ জান তো? ভারতবর্ষ প্রায় সেইরূপ নয় শত ক্রোশ লম্বা এবং উত্তর দিকে প্রায় আট শত ক্রোশ চওড়া। এখন বুঝিয়া দেখ আমাদের এদেশ কত বড আর এ দেশে কত মানুষ বাস করে তাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে। তোমরা অঙ্ক শিখিয়াছ—কোটী কাহাকে বলে জান বোধ হয়। ভারতবর্ষে প্রায় পঁচিশ কোটী লোকের বাস। জান কি তোমাদের পাঠশালায় কত ছেলে পড়ে? বল দেখি তোমাদের পাঠশালার মত কত পাঠশালা একত্র হইলে পঁচিশ কোটী ছেলে হইবে?

ধর্ম্ম ও জাতি।—ভারতবর্ষে এখন যত লোক বাস করে তাহার বেশির ভাগই হিন্দু। অতি প্রাচীন কালে এদেশে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্ম্মের লোক বড় ছিল না। এখন যে মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা এদেশে পরে আসিয়াছে। তাহারা কেমন করিয়া এদেশে আসিল তাহার বৃত্তান্ত পরে বলিব।

হিন্দুদেরই এদেশ, এজন্য ভারতবর্ষের আর একটী নাম হিন্দুস্থান। হিন্দুরা অনেক দেবতা মানেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান। হিন্দুদিগের মধ্যে চারিটী শ্রেণী আছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে ব্রাহ্মণই সকলের অপেক্ষা অধিক মান্য। হিন্দুরা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন। আমরা সেই হিন্দু-দিগের সন্তান, এজন্য আমরাও আর্য্য।

ধর্ম্মশাস্ত্র।—যে গ্রন্থে ধর্ম্ম কর্ম্মের সব ব্যবস্থা লেখা থাকে তাহার নাম শাস্ত্র। হিন্দুদের এই সকল শাস্ত্র যে ভাষায় লেখা তাহার নাম সংস্কৃত। সেই সংস্কৃতের মত সুমিষ্ট ও সুন্দর ভাষা পৃথিবীতে আর নাই। হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম বেদ। "একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ," এ সকল কথা যে গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিয়াছে সেই জানে। চারি বেদ তো শুনি-য়াছ, তাহার নাম কি কি জান? ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ।—বেদ ছাড়া দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি অনেক প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে, তাহার কথা তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে। এখন তোমাদিগকে দুই খানি গ্রন্থের কথা শুনাইতেছি, তাহাদের নাম রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ।

রামায়ণ।—রামায়ণ আর্য্যদিগের এক খানি পুরাতন গ্রন্থ। বাল্মিকি নামে এক জন মহর্ষি সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণের রচনা করেন। কৃত্তিবাস ওঝা নামক এক জন পণ্ডিত সংস্কৃত রামায়ণের কথা আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে রামায়ণ লিখিয়াছেন তাহার নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ। রামায়ণ বেশ বড় পুস্তক। আমি আপাততঃ সঙ্ক্ষেপে রামায়ণের গল্প বলিতেছি।

রামাদির জন্ম।—ভারতবর্ষের মধ্যে অযোধ্যা নামে এক প্রদেশ আছে। পূর্ব্বকালে তথায় দশরথ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন রাণী—কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রা। বৃদ্ধ বয়সে রাজার চারি পুত্র হয়। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কেকয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। চারি ভ্রাতার মধ্যে সহোদর ভাইয়ের মত ভালবাসা ছিল এবং তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া নানা প্রকার লেখা পড়া ও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। সকলের বড় রাম বিশেষ গুণবান ও বিখ্যাত। সুমিত্রা রাণীর দুই পুত্রের মধ্যে লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের বিশেষ অনুগত ছিলেন।

বিবাহ।—সেই সময়ে মিথিলা নামে আর এক প্রদেশে জনক নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সীতা নামে এক কন্যা হয়। তিনি জনক রাজার কন্যা, এই জন্য তাঁহার

আর এক নাম জানকী এবং মিথিলা প্রদেশে তাঁহার জন্ম, এই জন্য তাঁহার আর এক নাম মৈথিলী। জনক রাজার গৃহে এক অতি প্রকাণ্ড ধনুক ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহার সেই ধনুক ভঙ্গ করিতে পারিবে, তিনি তাঁহারই সহিত জানকীর বিবাহ দিবেন। কত দেশ বিদেশের বড় বড় রাজা, বড় বড় বীর, বড় বড় যোদ্ধা আসিলেন, কিন্তু ধনুক

"ভঙ্গ করা দূরে থাক্ কঠিন সে অতি,
স্থানান্তর করিবার নহিল শকতি।"

অবশেষে দশরথ রাজার বড় পুত্র বীরবর রামচন্দ্র

"দুইখণ্ড করি ধনু দিলেন ফেলিয়া,
হইল পরম সুখী সকলে হেরিয়া।"

তখন কাজেই রামের সহিত সীতার বিবাহ স্থির হইল; কিন্তু তিনি আর তিন ভাইকে ফেলিয়া একা বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। এই জন্য জনক রাজার আর এক কন্যা এবং তাঁহার ভ্রাতার দুই কন্যার সহিত লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের এবং সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হইল।

অভিষেক মন্ত্রণা।—বিবাহের কিছুদিন পরে দশরথ রামকে রাজা করিয়া সিংহাসনে বসাইবেন স্থির করিলেন। রাজ্য যুড়িয়া চারিদিকে মহা ঘটা পড়িল।

"লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে,
নানা রাজা আইল কটক সব সঙ্গে,

নানা রঙ্গে রথ রথী হাতী ঘোড়া সাজে,
নানা জাতি বাদ্য শুনি চারিদিকে বাজে।
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ,
নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যা ভুবন।"

কিন্তু শেষে আবার যত হাসি তত কান্না পড়িল। কৈকেয়ী রাণী এক সময়ে রাজার বড় সেবা করায় দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুইটী বর দিবেন স্বীকার করিয়াছিলেন। মন্থরা নামে তাঁহার এক ভারী দুষ্ট দাসী ছিল। এক্ষণে, সময় বুঝিয়া, রাণী ঠাকুরাণী মন্থরার পরামর্শে, রাজার নিকট সেই দুই বর চাহিয়া বসিলেন! রাণী যে কি সর্ব্বনেশে বর চাহিবেন তাহা রাজা জানিতেন না। আজি এই আনন্দের দিনে রাণী যাহা চাহিবেন তাহাই দিতে তিনি স্বীকার করিলেন। তখন রাণী বলিলেন, এক বরে রামকে রাজা না করিয়া ভরতকে রাজা করিতে হইবে, আর এক বরে রামকে চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়া বাস করিতে হইবে। কালি রাম রাজা হইবেন আজি এ কি সর্ব্বনাশ! রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু তিনি বড়ই সত্যবাদী, তাঁহার কথা কোন মতেই নড় চড় হইবার নহে। কাজেই রামকে বনে যাইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী সীতা ও অনুগত ভাই লক্ষ্মণও সন্ন্যাসীর মত বেশ ভূষা করিয়া বনে গমন করিলেন। রাজা শোকে অধীর, কৌশল্যা ও সুমিত্রা কাঁদিয়া আকুল, এবং

সর্ব্বত্র হাহাকার শব্দ পড়িল। দারুণ শোকে রাজার মৃত্যু হইল। ভরত এই সকল কাণ্ডের সময় মাতুলালয়ে ছিলেন। তাঁহাকে সংবাদ দিলে তিনি আসিয়া সমস্ত জানিতে পারিলেন এবং আপন মাতাকে তিরস্কার করিয়া স্বয়ং রাজা হইতে অস্বীকার করিলেন। তাহার পর যথা-রীতি পিতার সৎকার করিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অনেক লোকজন সঙ্গে বনে গমন করিলেন। তিনি রামকে ফিরিয়া আসিয়া রাজা হইবার জন্য অনেক কাঁদাকাটি করিলেন, কিন্তু রাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি ফিরিয়া গেলে পিতার কথা অটুট থাকে না; অতএব যে কার্য্যে পিতা মিথ্যাবাদী হন তাহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। তিনি ভরতকে ফিরিয়া গিয়া রাজ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া

"যোড়় হাতে ভরত বলেন সবিনয়,
কেমনে করিব রাজ্য মম কার্য্য নয়।
তোমার পাদুকা দেও করি গিয়া রাজা,
তবে তো পারিব রাম পালিবারে প্রজা।"

তাহার পর রামের পাদুকা লইয়া ভরত ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই পাদুকা রাজার ন্যায় সিংহাসনে রাখিয়া আপনি তাহার সেবক হইয়া রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন।

বনবাস।—ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে দণ্ডক নামে এক বড় বন ছিল। রাম ক্রমে সেই বনে উপস্থিত হই-

লেন এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বনের ফল মূল খাইতেন, গাছের ছাল পরিতেন এবং লতা পাতা দিয়া কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে থাকিতেন। তাঁহারা কাহারও সহিত বিবাদ বা কাহারও হিংসা করিতেন না। এত কষ্টে পড়িয়াও তাঁহারা সেখানে এইরূপে সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই আর এক বড় ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইল।

সীতাহরণ।—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সিংহল বা লঙ্কা নামে এক দ্বীপ আছে। রাবণ নামে একজন অতি বলবান ও দুর্দ্দান্ত লোক সেখানকার রাজা ছিল। রামায়ণে লেখা আছে যে রাবণ রাক্ষস ছিল। যাহা হউক, সেই রাবণ রাজা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকেও আসিয়া উৎপাত করিত। এক দিন রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনেই কুটীরে ছিলেন না, রাবণ সেই সুযোগে বৃদ্ধ ভিক্ষুক সাজিয়া সীতার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ভিক্ষুককে ফিরাইয়া দেওয়া মহা পাপ জানিয়া, সীতা রাবণকে ভিক্ষা দিবার জন্য যেমন কুটীরের বাহিরে আসিলেন, অমনই সে সীতাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আপনার রথে তুলিয়া লঙ্কায় লইয়া গেল। রাম ও লক্ষ্মণ কুটীরে আসিয়া দেখিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সীতা ঘরে নাই!

সীতা অন্বেষণ।—তখন রাম ও লক্ষ্মণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সীতার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

"প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।

অনেক কষ্টের পর তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, লঙ্কার রাবণ রাজা সীতাকে লইয়া গিয়াছে। কি হইবে? সে দুর্দ্দান্ত রাবণ রাজা—তাঁহারা দুই ভাই সন্ন্যাসী! কেমন করিয়া সেখান হইতে সীতাকে আনা যাইবে? এইরূপ দুঃসময়ে তাঁহাদের অনেক সহায় জুটিয়া গেল। সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি অনেক বীর রামের পক্ষ হইল। এই বীরেরা বানরজাতি বলিয়া রামায়ণে লেখা আছে।

যুদ্ধ।—রাম ও লক্ষ্মণ আপনাদের বানরাদি দলবল সঙ্গে লইয়া লঙ্কায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় রাবণের ভাই বিভীষণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিলেন; তাহাতে রামের বিশেষ সুবিধা হইল। বিভীষণ ভিতরকার সংবাদ সকল রামকে জানাইতে লাগিলেন। এই জন্যই লোকে বলে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ,' 'ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।' বহুদিন ধরিয়া রাম রাবণের যুদ্ধ চলিল। অবশেষে রাবণ সবংশে নির্ব্বংশ হইয়া গেল। তখন লঙ্কার রাজত্ব বিভীষণকে দিয়া রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

রাম রাজা।—চৌদ্দ বৎসর রামের বনে থাকিবার কথা, সে চৌদ্দ বৎসর সীতা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইল। তখন তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন; ভরত তাঁহাকে পরম সমাদরে সিংহাসনে বসাইলেন এবং প্রজা-

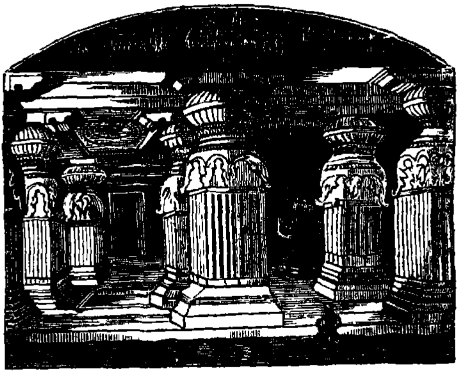
গণ বড়ই আনন্দিত হইল। তিনি ভ্রাতাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে প্রজাগণ সকল প্রকারে এতই সুখী হইয়াছিল যে, লোকে কথায় কথায় এখনও রাম-রাজত্বের উল্লেখ করিয়া থাকে। প্রজাদের আনন্দ ও সন্তোষের জন্য রাম সকলই করিতে পারিতেন।

সীতার বনবাস।—কিছু দিন পরে প্রজার সন্তোষের জন্য রাম সীতাকে বনে পাঠাইয়া দিলেন। সীতা তখন গর্ভিণী। বনে গিয়া সীতা অকূল পাথার দেখিতে লাগিলেন। যে বনে সীতাকে পাঠান হইল, তাহারই নিকটে রামায়ণের গ্রন্থকার মহর্ষি বাল্মিকির আশ্রম ছিল। তিনি আসিয়া সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং কন্যার ন্যায় যত্নে রাখিয়া দিলেন। সেখানে সীতার এক সঙ্গে দুই পুত্র হইল; তাহাদের নাম লব ও কুশ। মহর্ষি তাহাদের নানা বিদ্যা শিখাইলেন। শিশুদ্বয় বড় বীর ও বুদ্ধিমান হইল। তাহারা আপনাদের পিতার নাম বা পরিচয় কিছুই জানিত না। এত বড় রাজার পুত্র হইয়াও তাহারা বনবাসী হইয়া রহিল।

অশ্বমেধ যজ্ঞ।—পূর্ব্বকালে যে রাজা অন্যান্য রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বলবান হইতেন তিনি একটা অশ্বের কপালে জয়-পতাকা বাঁধিয়া অন্যান্য রাজার রাজ্যের মধ্যে দিয়া চালাইয়া আনিতেন। যদি কোন রাজা ঘোড়া আটক

না করিত, তাহা হইলে বুঝা যাইত, সে রাজা অধীনতা স্বীকার করিল। যদি কেহ আটক করিত তাহা হইলে তাহার সহিত সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় ও অধীন করিতে হইত। এইরূপে সকল রাজ্য দিয়া অশ্ব ঘুরিয়া আসিলে প্রমাণ হইত যে, সে রাজা আর আর রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহার পর সেই অশ্বকে বলি দেওয়া হইত এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজা ও অনেক লোক জন নিমন্ত্রণ করিয়া সমারোহে ভোজ ও আমোদ করা হইত। রামচন্দ্র এইরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ঘোড়া ক্রমে ক্রমে বাল্মিকির তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়সে বালক হইলেও লব-কুশ মহাবীর, তাহারা ছাড়িবে কেন? রামের ঘোড়া তাহারা আর যাইতে দিল না। ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একে একে শত্রুঘ্ন, ভরত, লক্ষ্মণ, রামচন্দ্র, হনূমান প্রভৃতি সকলেই লব-কুশের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। বালকেরা জানে না যে, তাহারা আপনার বাপ খুড়াকেই মারিয়া ফেলিযাছে। সীতা সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালকেরা দেখিয়া শুনিয়া ভাবিল, একি হইল! এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মিকি আসিয়া সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। রামায়ণে লিখিত আছে যে, বাল্মিকির চেষ্টায় সকলের মৃতদেহে আবার প্রাণ আসিল। তাহার পর মহর্ষির আজ্ঞায় লব-কুশ রামের অশ্ব ছাড়িয়া দিল। রাম অশ্ব লইয়া মহানন্দে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

সেই যজ্ঞসভায় মহর্ষির সহিত লব-কুশও উপস্থিত হইল। রাম জানিতে পারিলেন যে, ঐ দুই বালক তাঁহারই পুত্র। তখন রাম সীতার শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। রামের আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বাল্মিকি সীতাকে সেই স্থানে আনাইলেন, কিন্তু এবারেও লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে সীতাকে গ্রহণ করিতে মত দিল না। এত কষ্টের পরেও এমন হইল দেখিয়া সীতা মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার কিছু কাল পরে রাম লক্ষ্মণাদি চারি ভাইও প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।



ইলোরার ইন্দ্রসভা।

মহাভারত।

মহাভারত।—এখন তোমাদের আর যে গ্রন্থের গল্প শুনাইব তাহার নাম মহাভারত। সে অতি প্রকাণ্ড পুস্তক, মহর্ষি বেদব্যাস তাহার রচনা করেন। সেই মূল মহাভারতের মর্ম্মে কাশীরাম দাস নামে এক জন বাঙ্গালি কবি বাঙ্গলায় মহাভারত প্রস্তুত করিয়াছেন। সংক্ষেপে মহাভারতের গল্প বলিতেছি শুন।

কুরু-পাণ্ডব।—পূর্ব্বকালে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভাই রাজা ছিলেন। হস্তিনাপুর নামে নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল, এখন আর সে হস্তিনাপুর নাই। চির দিন পৃথিবীতে কিছুই সমান থাকে না। পাণ্ডুরাজার পাঁচ পুত্র—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। আর ধৃতরাষ্ট্র রাজার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ছিল। পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব আর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব নামে খ্যাত। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদি ভাইপোদের নিজের ছেলের মত করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব ও কৌরবেরা একত্রে যুদ্ধ ও লেখা পড়া শিখিতে থাকিলেন।

জতু-গৃহ-দাহ।—ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, এজন্য তিনি রাজকার্য্য করিতে পারিতেন না। এক্ষণে তিনি সকলের

বড় ও পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে রাজা করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। ইহাতে পাণ্ডবদিগের বড় মান হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা বড়ই দুঃখিত হইল ও হিংসায় ফাটিতে লাগিল। কিসে পাণ্ডবদের সর্ব্বনাশ করা যায় তাহারা তাহাই ভাবিতে লাগিল। শেষে এক কৌশল করিয়া পাণ্ডবগণকে বারণাবত নামে এক নগরে পাঠাইয়া দিল। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই ও তাঁহাদের মাতা বারণাবতে গমন করিলেন। সেখানে পাণ্ডবদিগের থাকিবার জন্য দুষ্ট কৌরবেরা অনেক গালা, তৈল, ঘৃত প্রভৃতি সামগ্রী মিশাইয়া এক প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, যখন পাণ্ডবেরা সেই বাটীতে ঘুমাইয়া থাকিবেন তখন তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পোড়াইয়া মারিব; তাহা হইলেই তাহাদের সকল জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু ভগবান চিরকালই ধার্ম্মিকের সহায়। পাণ্ডবেরা সেই বাটীতে গিয়াই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন। তখন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, দুই প্রহর রাত্রে, সেই ঘরে আপনারা আগুন লাগাইয়া দিয়া বনের মধ্যে পলাইয়া গেলেন। বাটী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া গেল। কৌরবেরা বুঝিল যে পাণ্ডবেরা পুড়িয়া মরিয়াছে। তখন তাহারা নির্ভাবনায় সমস্ত রাজ্য, ধন, সৈন্য, সামন্ত দখল করিয়া রাজা হইয়া বসিল।

পাণ্ডবদিগের বিবাহ।—এদিকে পাণ্ডবেরা নিতান্ত

নিরুপায় হইয়া বনের মধ্যেই লুকাইয়া থাকিলেন। পাছে দিনে বাহিরে আসিলে কৌরবেরা তাঁহাদের সন্ধান জানিতে পারে, এই ভয়ে তাঁহারা রাত্রে গ্রামের মধ্যে বাহির হইয়া ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন তাহা আনিয়া মাতার হাতে দিতেন এবং মা তাহা সকল ছেলেকে ভাগ করিয়া খাইতে দিতেন। সেই সময়ে পঞ্চাল নামে আর এক প্রদেশে দ্রুপদ নামক এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার দ্রৌপদী নামে এক কন্যা ছিলেন। রাজা আকাশের উপর এক সোণার মাছ রাখিয়াছিলেন, তাহার নীচে এক চাকা ঘুরিতেছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি হেট-মুণ্ডে সেই চাকার মধ্য দিয়া বাণ চালাইয়া ঐ মাছের চক্ষু বিঁধিতে পারিবে তাহারই সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ দিবেন। এই কাণ্ডের নাম লক্ষ্যবেধ। বনবাসী পাণ্ডবেরা এই সংবাদ পাইয়া পঞ্চালে আসিলেন, এবং এক কুম্ভকারের বাটীতে লুকাইয়া থাকিলেন। নিয়মিত দিনে দ্রুপদ রাজার বাটীতে নানা দেশের রাজারা আসিলেন; পাণ্ডবেরা পাঁচভাইও ভিখারী ব্রাহ্মণ সাজিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজারা

"একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম,
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম।
কোথায় ধনুক পড়ে কোথায় আপনি,
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি।

কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক,
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলাক ঝলাক।
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি,
ধূলায় ধূসর তনু যায় গড়াগড়ি।
বড় বড় ভূপতির দেখি অপমান,
ভয়ে আর কেহ নাহি হলো আগুয়ান।”

রাজারা তো অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন; এদিকে মহাবীর অর্জ্জুন উঠিয়া সেই মৎস্যের চক্ষু বিঁধিয়া ফেলিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি পড়িল। তাহার পর দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পাণ্ডবেরা পাঁচ জন রাত্রে আপনাদের বাসায় ফিরিলেন। সেখানে তাঁহাদের মা, সারাদিন না খাওয়া না দাওয়া, ছেলেদের জন্য কতই ভাবনা ভাবিতেছিলেন। তিনি তো এ সকল কথা জানিতেন না, মনে করিয়াছিলেন ছেলেরা প্রতিদিন যেমন ভিক্ষা করিতে যায়, আজিও বুঝি তেমনই গিয়াছে। এমন সময়ে পাণ্ডবেরা আসিয়া মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন,—“মা, ঘরের দরজা খোল, কেমন ভিক্ষা আনিয়াছি দেখ।” মা মনে করিলেন, প্রতিদিন ছেলেরা যেমন খাইবার সামগ্রী ভিক্ষা করিয়া আনে, আজিও বুঝি তেমনই কিছু আনিয়াছে। তাঁহার ছেলেরা যে সেদিন বিবাহ করিবার কনে আনিয়াছে তাহা তো তিনি জানিতেন না, কাজেই ঘরের দরজা খুলিবার অগ্রেই বলিয়া ফেলিলেন,—“যাহা আনি-

য়াছ বাবা, তাহা সকলে ভাগ করিয়া লও।" মার আজ্ঞা কোন মতেই অন্যথা হইবার নহে, তখন পাঁচ ভাইয়ে এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এমন কথা কখন শুনিয়াছ কি? এক কন্যার একজনের অধিক বরের কথা পাণ্ডবদের ছাড়া অন্য কোথায় শুনা যায় নাই। এই বিবাহের গোলে পাণ্ডবদের পরিচয় সকলেই জানিয়া ফেলিল। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সমস্ত সংবাদ জানিলেন এবং লোক পাঠাইয়া পাণ্ডবদিগকে আদরের সহিত বাটীতে লইয়া গেলেন। পাছে তাঁহার নিজের ছেলেদের সহিত ভাইপোদের আবার বিবাদ হয়, এই ভয়ে তিনি পাণ্ডবদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করিলেন। পাণ্ডবদের সেই রাজ্যের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ।

রাজসূয়।—পাণ্ডবদিগের রাজ্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজা যুধিষ্ঠির এক যজ্ঞ করিয়া, তিনি যে সকল রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই যজ্ঞের নাম রাজসূয়। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে ভারী সমারোহ হইয়াছিল। রাজা দুর্য্যোধন সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে বড় অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বড় কৌশল করিয়া বাড়ী সাজাইয়াছিলেন। ঘরের ।র্শে এমনই ভাবে বড় বড় আয়না রাখিয়াছিলেন যে তাহা বুঝা যায় না, এবং তাহাতে যে

ছায়া পড়ে তাহা দেখিলে সেদিকেও আবার ঘর আছে বলিয়া মনে হয়। রাজা দুর্য্যোধন তাই মনে করিয়া যেমন সেই দিকে যাইবেন অমনই ঝনাৎ করিয়া আপনার উপর পড়িয়া গেলেন। সাদা ধপ্ ধপে পাথরের মেঝের মাঝখানে প্রকাণ্ড পুকুর। রাজা দুর্য্যোধন তাহা জানিতেন না, তিনি পাথরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ধপাস্ করিয়া জলের মধ্যে পড়িয়া গেলেন এবং কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া গেল। এইরূপে অপ্রতিভ হইয়া এবং পাণ্ডবদের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধনের মনে বড় রাগ ও হিংসা হইল। কিসে পাণ্ডবদিগকে অপদস্থ করিতে পারা যায় তিনি তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

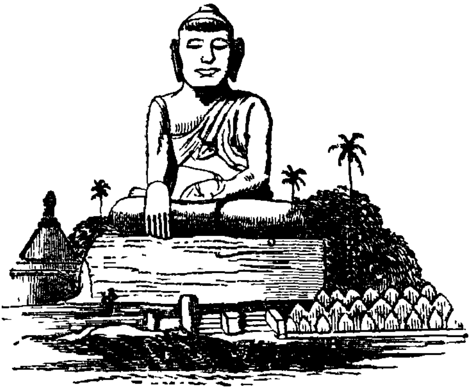
পাশাখেলা।—দুর্য্যোধনের শকুনি নামে এক মাতুল ছিলেন। এ ব্যক্তি বড় দুষ্টবুদ্ধি এবং পাশা খেলিতে অত্যন্ত নিপুণ। দুর্য্যোধন এই মামার সহিত পরামর্শ ঠিক করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনাপুরে আসিলেন। বাজি রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। দুর্য্যোধনের পক্ষে শকুনি চাতুরী করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন; তাহাতে যুধিষ্ঠিরের ক্রমাগত হারি হইতে লাগিল। রাজ্য, ধন, সমস্তই, এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত, যুধিষ্ঠির হারিয়া গেলেন। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত অপমান করিতে আরম্ভ করিল। তখন বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র

আসিয়া সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া দিলেন, সুতরাং এবার কৌরবদের আশা মিটিয়াও মিটিল না। কিছুকাল পরে আবার পাশা খেলা আরম্ভ হইল। স্থির হইল এবার যে পক্ষ হারিবে তাহাদের বারো বৎসর বনে থাকিতে হইবে এবং এক বৎসর এমনই ভাবে থাকিতে হইবে যে কেহ তাহাদের কোন সংবাদ জানিতে না পারে। এবারেও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল; কাজেই তাঁহারা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলেন। তাঁহারা তেরো বৎসর কাটাইয়া আপনাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে বহু সৈন্য সামন্ত ও রাজ্য লাভ করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।—কথামত তেরো বৎসর কাটিয়া গেল বটে, তথাপি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইলেন না। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া পাণ্ডবেরা কৌরব শত্রুগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষেই বিশেষ উদ্যোগ হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজাই হয় কৌরব পক্ষে, না হয় পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিলেন। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এত বড় তুমুল যুদ্ধ ভারতবর্ষে আর কখন হয় নাই। আঠারো দিন এই যুদ্ধ চলিল। কৌরবেরা একে একে সকলে মারা পড়িলেন; কেবল রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার রাণী বাঁচিয়া থাকিলেন। তাঁহারা মনের দুঃখে,

সমস্ত রাজ্য যুধিষ্ঠিবকে দিবা, বনে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে প্রাণ হারাইলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌবব বংশ শেষ হইল এবং পাণ্ডবদেব অনেক জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও আত্মীযেব মৃত্যু হইল। ইহাতে যুধিষ্ঠিবের মনে বড়ই কষ্ট ও শোক জন্মিল। রাজ্যসুখ পাণ্ডবদের আর ভাল লাগিল না। তাঁহাবা বাজ্য ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে চলিযা গেলেন এবং একে একে সকলেই প্রাণ হাবাইলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।



গৌতম।—এখন তোমাদেব আব এক রাজাব ছেলের আশ্চর্য্য গল্প বলি শুন। আমাদের এই দেশে কপিলবস্তু নামে এক নগর ছিল; সেখানে শুদ্ধোদন নামক এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার এক ছেলে,

তাঁহার নাম গৌতম। ছেলেবেলা হইতেই এই রাজার ছেলের ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে যেমন টান ছিল এমন আর কোন দিকেই ছিল না। তিনি যত বড় হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার ধর্ম্মের দিকে ঝোঁক আরও বাড়িতে লাগিল। তিনি গাড়িতে চড়িয়া কখন কখন নগরের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইতেন। যখনই বহির হইতেন তখনই মানুষের নানা কষ্ট ও নানা অবস্থা দেখিতে পাইতেন। কখন দেখিতেন, মানুষ মরিয়া গিয়াছে, তাহার আপনার লোকেরা তাহাকে কাঁধে করিয়া পোড়াইতে লইয়া যাইতেছে। অমনই তাঁহার মনে হইত, এই রূপে সকলকেই মরিতে হইবে, চিরদিন কেহই এখানে থাকিবে না। কখন দেখিতেন, বুড়া মানুষ পাকা চুল লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতেছে। অমনই তাঁহার মনে হইত, বাঁচিয়া থাকিলে আমাকেও এইরূপ হইতে হইবে, এমন গোল শরীর কখনই থাকিবে না। কখন দেখিতেন, রোগী যাতনায় আহা উহু করিতে করিতে চলিতেছে। তখনই তাঁহার মনে হইত, এরূপ অবস্থা সকলেরই আছে, চিরদিন সমান সুখে কখনই যায় না। এইরূপ দেখিতে দেখিতে ও ভাবিতে ভাবিতে গৌতমের মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। এ সংসার, ঘর, দ্বার, সুখ, ঐশ্বর্য্য কিছুই তখন ভাল লাগিতে লাগিল না। তিনি মনে করিলেন, যে লোক কিছুতেই কাতর না হয় সেই সুখী।

বুদ্ধ।—গৌতমের একটী ছেলে হইযাছিল। কিন্তু তাঁহার তখন আব কিছুতেই মাযা ছিল না; তিনি তখন বনে গিয়া ধর্ম্মেব ভাবনা ভাবিবাব জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিযাছেন। এক দিন বাত্রিকালে কাহাকেও কোন কথা না বলিযা তিনি বাটী হইতে চলিযা গেলেন। সমস্ত বাত্রি চলিতে লাগিলেন। তাহাব পর ভোব বেলা তাঁহাব গাযে যে সকল অলঙ্কাব ও পোষাক ছিল তাহা খুলিয়া পিতার নিকট ফিরিযা পাঠাইলেন এবং একজন সামান্য লোকের কাছে তাহাব ছেঁড়া কাপড চাহিযা লইযা তাহাই গাযে দিলেন। এই সমযে তাঁহাব বযস ত্রিশ বংসব। বনে যাইযা গৌতম কেবল ধর্ম্মেবই ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন। এখন হইতে তাঁহাব নাম হইল বুদ্ধ অর্থাং জ্ঞানী।

ধর্ম্ম প্রচার।—ক্রমে তাঁহাব নাম ও যশ চারিদিকে ছডাইযা পড়িল। তখন বাজা প্রজা, মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুডো, দলে দলে আসিযা ধর্ম্ম-কথা শুনিবার জন্য তাঁহাব পায়ে পডিতে লাগিল। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম লোকদের শিখাইতেন তাহার নাম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। অনেক দিন পবে বুদ্ধ আর একবাব বাটিতে ফিবিযাছিলেন। যে বাটী হইতে তিনি কত পোষাক পবিয়া, কত অলঙ্কার গায়ে দিযা বাহির হইয়াছিলেন, সেই বাটীতে তিনি আবার গেরুয়া কাপড পরিয়া, ভিখারীব ন্যায় সাজে, নারিকেল-মালা হাতে করিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আর ঘরে থাকিতে

যান নাই—থাকিলেনও না। আপনার স্ত্রী ও পুত্রকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া মহাত্মা বুদ্ধদেব আবার বনে ফিরিয়া আসিলেন।

মৃত্যু।—আশী বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করিলেন। তিনি মরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাম ও যশ কখনই মরিবে না। কত দেশে ও কত রাজ্যে এখনও তাঁহার ধর্ম্ম চলিতেছে। দেখ, তিনি রাজার ছেলে হইয়াও সংসারের সুখে কখন মন দেন নাই; কিন্তু তিনি যে সুখে সুখী ছিলেন তাহা কয় জন রাজার কপালে ঘটে?

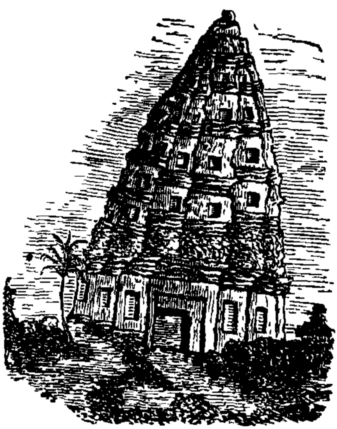
চন্দ্রগুপ্ত।—বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এদেশে চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন বিখ্যাত রাজা হইয়াছিলেন। চাণক্য নামে তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। তোমরা চাণক্য-শ্লোকের কথা শুনিয়াছ কি? শুনা যায় রাজা চন্দ্রগুপ্তের এই মন্ত্রী শিশুগনকে হিত উপদেশ দিবার জন্য কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সকল শ্লোকের নাম চাণক্য-শ্লোক। তোমরা যদি চাণক্য-শ্লোক না পড়িয়া থাক তাহা হইলে শীঘ্রই তাহা পাঠ করিও; তাহাতে অনেক ভাল কথা আছে।

অশোক রাজা।—রাজা চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক রাজার সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বড় উন্নতি হইয়াছিল। তখন এ দেশের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ হইয়াছিল। অশোক রাজা দেশের সমস্ত বৌদ্ধ একত্রিত করিয়া মহাসভা করিয়া-

ছিলেন এবং সেই মহাসভা হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিয়ম সকল বাঁধাবাঁধি করিয়া দিয়াছিলেন। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের নানা স্থানে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সংক্রান্ত থাম, মন্দির, মঠ প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতি।—অশোক রাজার মৃত্যুর কিছুদিন পর হইতে এদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আদর কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। এক সময়ে যে ধর্ম্মের বড়ই আদর হইয়াছিল, এখন আর এ দেশে তাহার কোনই আদর নাই। অন্যান্য অনেক দেশে এখনও সকল লোকই বৌদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু যে দেশ সে ধর্ম্মের গোড়া, সেখানে এখন আর কেহ তাহা মানে না। কত দেশেই এখনও বুদ্ধদেবের ঠাকুর গড়াইয়া পূজা করে। আমাদের দেশের পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মদেশ নামে এক দেশ আছে, সেখানে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধঠাকুর আছেন। সেখানকার সেই ঠাকুরের ছবি একুশের পাতায় আঁকা আছে। বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে দক্ষিণভারতে বোম্বাই নগরের নিকটে, ইলোরা নামক পর্ব্বতের ইন্দ্রসভা প্রভৃতি গুহা এবং সাল্‌সেট নামক দ্বীপের পর্ব্বত-গুহা সকল অতিশয় বিখ্যাত। ঐ দুই স্থানের অত্যাশ্চর্য্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহা সকল নানা প্রকার থাম, দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃ-

তিতে পরিপূর্ণ এবং সেই সমস্ত গুহা ও মূর্ত্তি বড় বড় পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ভাবিয়া দেখ, ঐ কার্য্যে কত দিন ধরিয়া কত লোককেই খাটিতে হইয়াছে এবং কত টাকাই, না জানি, সেজন্য খরচ হইয়া গিয়াছে! ঐ দুই স্থানে হিন্দুদেরও কৃত অনেক গুহা আছে। তেরোর পাতায় ইলোরার ইন্দ্রসভা গুহার যে একখানি ছবি আছে, বোধ হয়, তাহা হিন্দুদেরই কৃত।



বুদ্ধ-গয়ার বৌদ্ধ মন্দির।

গ্রীক ও শকদিগের আক্রমণ।

আলেকজাণ্ডর।—তোমরা নিশ্চয়ই ভূ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছ। আচ্ছা, বল দেখি গ্রীস কোথায়? ইয়ুরোপ মহাদেশের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের উপর একটী ছোট দেশ আছে, তাহার নাম গ্রীস। সেই দেশের লোকদের নাম গ্রীক্। পূর্ব্বকালে সেই দেশে আলেকজাণ্ডর নামে এক বড় বীর ও যোদ্ধা রাজা ছিলেন। তিনি আর আর অনেক দেশ জয় করিয়া, চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবার কিছু পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিয়াছিলেন। এখানকার দুই একজন রাজার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি এ দেশের কোন অনিষ্ট করেন নাই, এবং এখানকার অনেক রাজার সহিত বিশেষ বন্ধুতা করিয়াছিলেন।

সেলিউকস্।—আলেকজাণ্ডরের সহিত যে সকল বীর এ দেশে আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কাহাকে কাহাকে তিনি এখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডর চলিয়া গেলে সেলিউকস্ নামে তাঁহার একজন সেনাপতি পঞ্জাব প্রদেশের কিঞ্চিৎ অংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ক্রমে চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন সেলিউকস্ আপনার রাজ্য চন্দ্রগুপ্তের নিকটে বিক্রয় করিলা এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। সেলিউকস্ যাইবার সময় রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভায়

মেগাস্থিনিস্ নামে একজন সুবিখ্যাত গ্রীক্ পণ্ডিতকে রাখিয়া গিযাছিলেন।

গ্রীক্ মত।—মেগাস্থিনিস্ বহুদিন রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভায ছিলেন। তিনি অনেক দিন এ দেশে থাকিয়া তখনকার হিন্দুদের যেরূপ স্বভাব দেখিযাছিলেন তাহা লিখিয়া গিযাছেন। তিনি লিখিযাছেন যে, 'হিন্দুদের মধ্যে মানুষ কেনা বেচার ব্যবসায নাই। হিন্দুরা সকলেই সাহসী এবং এসিয়া মহাদেশের অন্যান্য সকল জাতির অপেক্ষা তাহারা বলবান। তাহাদের মধ্যে চোর নাই, এজন্য তাহাদের দরজায় তালা চাবি লাগাইতে হয না। তাহারা মিথ্যা বলিতে জানে না। তাহারা সকলে ধর্ম্ম পথে থাকিয়া রোজগার করে। তাহারা আইন আদালতের ধার ধারে না এবং কেহ কাহারও সহিত ঝগড়া করে না।'

বিক্রমাদিত্য।—গ্রীকেরা চলিয়া যাওয়ার প্রায দেড় শত বৎসর পরে এ দেশে বিক্রমাদিত্য নামে এক জন অতি প্রবল ও গুণবান রাজা হইযাছিলেন। এই রাজার সভায অনেক বড বড পণ্ডিত থাকিতেন। সেই সকল পণ্ডিতের মধ্যে নবজন পণ্ডিত অত্যন্ত বিখ্যাত এবং নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ। মহাকবি কালিদাস নামে এক অসাধারণ কবি সেই নবরত্নের একজন। কালিদাস নামক কবি যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার মত মিষ্ট ও চমৎকার পুস্তক আর দেখা যায় না। রাজা বিক্রমাদিত্য এত বিখ্যাত

হইয়াছিলেন যে, আজিও এদেশে তাঁহার সময় হইতে বৎসর গণনা চলিয়া আসিতেছে। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যে বৎসরের হিসাব চলিতেছে তাহার নাম সম্বৎ।

শালিবাহন।—বিক্রমাদিত্যের পরে এ দেশে আরও একজন বড় রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম শালিবাহন। গ্রীকদিগের আক্রমণের কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষের উত্তর দিক হইতে শক নামে আর এক জাতি আসিয়া এ দেশ অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিল এবং এখানকার লোকদিগকে বড় জ্বালাতন করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার পরে এই শালিবাহন রাজার চেষ্টায় শকেরা এ দেশ হইতে পলায়ন করে। শালিবাহন রাজার সময় হইতেও আর এক রকম বৎসর গণনা চলিয়া আসিতেছে, তাহার নাম শক। বল দেখি, এখন শকই বা কত, আর সম্বতই বা কত?

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুসলমান আক্রমণ।

পরাধীনতার ফল।—পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিলাম, সে সকল সময়ে আমাদের দেশ স্বাধীন ছিল, অর্থাৎ আমাদের দেশে আমাদেরই লোক রাজা ছিলেন। কাজেই তখন আমাদের দেশের ধর্ম্ম, আচার, বিদ্যা সকল বিষয়েরই বিশেষ উন্নতি ছিল। কিন্তু তাহার পরে মুসলমানেরা আমাদের দেশের রাজা হইলেন। প্রায় সাত শত বৎসর মুসলমানেরা ভারতবর্ষের উপর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের রীতি নীতি ও ধর্ম্মের অমিল থাকায়, ক্রমে ক্রমে এ দেশের ধর্ম্ম বিদ্যা, আচার, ব্যবহার সকল বিষয়েই বিশেষ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে যে আর্য্যজাতিকে দেখিয়া গ্রীকেরা এত সুখ্যাতি করিয়াছেন, সে জাতির এখন এই দুর্দ্দশা।

মহম্মদ।—তোমরা ভূ-বৃত্তান্তে আরব দেশের কথা পাঠ করিয়াছ সন্দেহ নাই। সেই আরব দেশের মধ্যে মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম হয়। মহম্মদের যখন চল্লিশ বৎসর বয়স তখন তিনি প্রচার করিলেন যে, জগদীশ্বর এক। সেই জগদীশ্বর আপনার পূজা লোকদিগকে শিখাই-

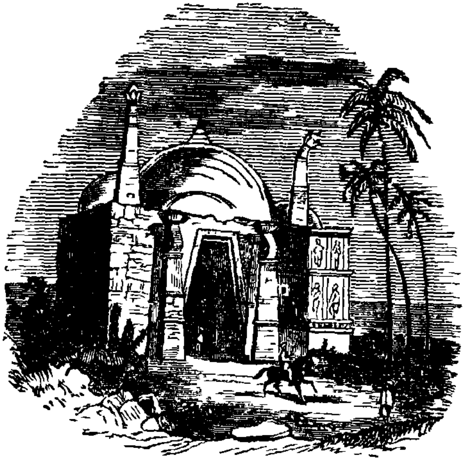
বার জন্য মহম্মদকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। তিনি এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এই গ্রন্থ জগদীশ্বরের আজ্ঞামতে লিখিত। এই গ্রন্থের নাম কোরাণ। প্রথমে আরব দেশের লোকেরা মহম্মদের বড় শত্রু হইয়া উঠিল, কিন্তু কিছুকাল পরে সকলেই আবার মহম্মদের শিষ্য হইল। মহম্মদের প্রকাশিত এই ধর্ম্মের নাম মুসলমান ধর্ম্ম। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরা ক্রমে ক্রমে এসিয়া মহাদেশের অনেক দেশ এবং ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশেরও কোন কোন দেশ জয় করিয়া ফেলিল।

মুহালিবের আক্রমণ।—আরবের পূর্ব্বে পারস্য দেশ, পারস্যের পূর্ব্বে আফগানিস্থান, এবং আফগানিস্থানের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ। পারস্য ও আফগানিস্থান মুসলমানেরা সহজেই পরাজয় করিয়াছিল, কিন্তু তখন তাহারা ভারতবর্ষের দিকে আইসে নাই। মহম্মদের মৃত্যুর বত্রিশ বৎসর পরে মুহালিব নামে একজন সেনাপতি ভারতবর্ষের কিছু দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং অনেক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমাদের দেশে মুসলমান আক্রমণের এই আরম্ভ (৬৬৪ খৃঃ অঃ)।

কাসিমের আক্রমণ।—ইহার অনেক দিন পরে (৭১১ খৃঃ অঃ) কাসিম নামে এক বীর অনেক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আইসেন। এ দেশের যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছিলেন সেখানকার

লোক কাটিয়া, দেবালয় ভাঙ্গিয়া, টাকা কড়ি লুটপাট করিয়া এবং যাহারা বাঁচিয়া ছিল তাহাদিগকে দাস করিয়া, তিনি অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। হিন্দুরা কাসিমের সহিত বড় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক রাণী, মেয়ে মানুষ হইয়াও, নিজ হস্তে কতই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার পর কাসিমের মৃত্যু হইল তাই রক্ষা, নহিলে না জানি আরও কত সর্ব্বনাশ হইত।

গজ্‌নির মাহমুদ।—আফগানিস্থানের মধ্যে গজ্‌নি নামে এক প্রধান নগর আছে। তাহা যে রাজ্যের রাজধানী সে রাজ্যের নামও গজ্‌নি রাজ্য। মাহমুদ নামে একব্যক্তি সেখানকার রাজা হইয়াছিলেন। (৯৯৭ খৃঃ অঃ) তিনি একবার দুইবার করিয়া ক্রমে বারো বার আমাদের দেশ আক্রমণ করেন। তিনি যে এদেশে কত লুটপাট করিয়াছেন এবং কত রকমে কত ক্ষতি করিয়াছেন তাহা আর তোমাদের কি বলিব। এদেশ হইতে সোণা, রূপা, হীরা, মুক্তা, টাকাকড়ি প্রভৃতি তিনি বোঝা বোঝা করিয়া বার-বার লইয়া গিয়াছেন। নগরকোট নামক স্থানের মন্দির লুঠ করিয়া মাহমুদের যে লাভ হইয়াছিল তাহা শুনিলে তোমরা অবাক হইবে। সাত লক্ষ সোণার মোহর, সাত শত মণ সোণা ও রূপার বাসন, দুই শত মণ খাটি সোণা, দুই হাজার মণ রূপা, কুড়ি মণ হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি সামগ্রী এক নগরকোট হইতে লইয়া মাহমুদ দেশে ফিরিয়া



সোমনাথের মন্দির।

স্থান। ভাবিয়া দেখ কাণ্ডখানা কি! তোমরা মথুরা নগরের নাম শুনিয়াছ কি? উহা হিন্দুদের এক প্রধান তীর্থ। মাহমুদ সেই মথুরা আক্রমণ করিয়া সেখানকার একেবারে সর্ব্বনাশ করিয়া ছিলেন। কুড়ি দিন ধরিয়া নগর লুণ্ঠন করিয়া যেখানে যাহা ছিল সমস্তই তো মাহমুদ লইলেন, আর মানুষও তো যত পারিলেন মারিলেন, বাড়ার ভাগ দেবমূর্ত্তি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং মন্দির সকল নষ্ট করিয়া দিলেন। এদেশে সোমনাথ নামে এক

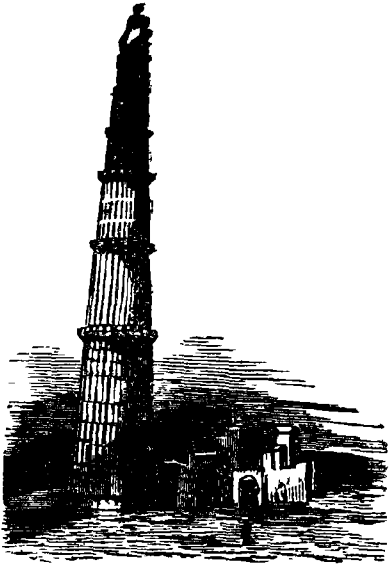
প্রসিদ্ধ মহাদেব ঠাকুর ছিলেন। মাহমুদ সেই দেবালয় আক্রমণ করিয়া অনেক ধন রত্ন পাইলেন। সে সকল তো লইলেন, আর সেই ঠাকুরকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সোমনাথের বড় জাঁকাল ও প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। সেই মন্দির মুসলমানেরা নষ্ট করিয়া আর এক রকম করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপরে তাহার ছবি দেওয়া হইল। এই রূপে মহামুদ যে এদেশের কত সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহা আর কত বলিব? বারো বার আক্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু না হইলে তিনি আর কতবার এদেশে আসিয়া আরও কত সর্ব্বনাশ করিতেন তাহা কে বলিতে পারে?

গোরের মহম্মদ।—মাহমুদের মৃত্যুর পর ক্রমে তাঁহার রাজ্য উৎসন্ন হইয়া গেল এবং অনেক দিন পরে গোর নামে আর এক নূতন রাজ্য হইল। সেই রাজ্যের রাজা মহম্মদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তিনিও মাহমুদের ন্যায় অনেকবার এদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মাহমুদ যেমন লুট করিয়া, মানুষ মারিয়া, চলিয়া যাইতেন এবং তাহার পর কিছু দিন এ দেশের কোন খবর রাখিতেন না, ইনি সেরূপ করিলেন না। ইনি যখন চলিয়া গেলেন তখন কুতব উদ্দীন নামক তাঁহার একজন ক্রীতদাসকে এখানে রাখিয়া গেলেন। ক্রীতদাস কি জান? পূর্ব্বকালে অসভ্য জাতিরা গরু, ছাগল, ভেড়ার মত মানুষও

কেনা বেচা করিত। যে যাহাকে কিনিত সে তাহাকে লইয়া যাহা খুসি করিতে পারিত—কেহই সেজন্য কোন কথা বলিতে পারিত না। সেই কেনা মানুষের ভাল কথা ক্রীত-দাস। কুতব উদ্দীন দিল্লী এবং আর দুই একটী স্থান দখল করিয়া বসিলেন। কুতবের বখতিয়ার খিলিজি নামে একজন অনুচর ছিলেন। তিনিই আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ জয় করিয়াছিলেন (১২০৩ খৃঃ অঃ)। সেই সময় হইতেই আমাদের দেশের পরাধীনতার আরম্ভ হইল। গোরের মহম্মদের মৃত্যু হইলে কুতব ভারতবর্ষে স্বাধীন হইয়া বসি-লেন। এতদিন মুসলমানেরা এ দেশ আক্রমণ করিয়া ইহার সর্ব্বনাশ করিতেন, এখন হইতে মুসলমানেরা ইহার রাজাও হইলেন।

দাস-বংশ।

কুতব উদ্দীন।—এত বড় ভারতবর্ষে যিনি প্রধান রাজা হইয়া বসিলেন (১২০৬ খৃঃ অঃ) তিনি গোড়ায় এক-জন ক্রীতদাস ছিলেন মাত্র। নিজের গুণে ও ক্ষমতায় সেই দাস ক্রমে কত রাজার রাজা হইয়া উঠিলেন। স্বাধীন ভাবে রাজা হওয়ার পর কুতব উদ্দীন চারি বৎসর মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি নিজে দাস ছিলেন, এজন্য তাঁহার বংশের নাম দাস বংশ।



কুতব-মিনার।

আল্‌তমাস।—কুতব মরিয়া গেলে তাঁহার ছেলে আরাম রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তিনি কোন কর্ম্মেরই লোক ছিলেন না। তাঁহার ভগ্নীপতি আল্‌তমাস তাঁহার হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া নিজে রাজা হইলেন (১২১১ খৃঃ অঃ)। ইনিও গোড়ায় কুতব উদ্দীনের ক্রীত-দাস ছিলেন। কিন্তু কুতব ইঁহাকে এতই ভাল বাসিতেন

যে, ইঁহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। আলতমাস ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগেও কিছু রাজ্য বাড়াইয়াছিলেন। দিল্লীর নিকটে এক আশ্চর্য্য থাম আছে, তাহার নাম কুতব-মিনার। এত বড় স্তম্ভ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এই স্তম্ভ কুতবউদ্দীনের সময়ে আরম্ভ হয় এবং আলতমাসের সময়ে শেষ হয়। ইহাতে উঠিবার আগাগোড়া সিঁড়ি আছে।

রেজিয়া বেগম।—আলতমাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অনুপযুক্ত ছিলেন; এজন্য তাঁহার ভগ্নী রেজিয়া বেগমকে সকলে সিংহাসনে বসাইল (১২৩৬ খৃঃ অঃ)। মুসলমানদিগের সময়ে, ইহার পূর্ব্বে বা পরে, আর কখন কোন মেয়ে মানুষ রাজত্ব করেন নাই। মেয়ে মানুষ হইলে কি হয়, রেজিয়ার অনেক গুণ ছিল। তিনি প্রতিদিন, রাজার মত পুরুষের বেশে, রাজসভায় বসিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাসদের মধ্যে দুই দল ছিল। একদল তাঁহার ভ্রাতার এবং অপর দল তাঁহার পক্ষে। যে দল তাঁহার ভ্রাতার পক্ষে তাহারা কেবলই রেজিয়ার দোষ খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিলে কাহার না দোষ পাওয়া যায়? একজন অতি সামান্য ক্রীতদাসকে রেজিয়া বড় অনুগ্রহ করিতেন। ইহা বড় দোষ মনে বলিয়া শত্রুরা মনে করিল। রেজিয়া আবার ক্রমে ক্রমে সেই দাসকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন।

'একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ' হইল আর কি! প্রধান সেনাপতি পদের ভারী মান, সব পদের চেয়ে এ পদ বড়। সভাসদেরা একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল এবং বিদ্রোহী হইল অর্থাৎ রেজিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। রেজিযাও সোজা মেয়েমানুষ নহেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। যে দাসের জন্য এত বিবাদ সে ব্যক্তি যুদ্ধে মারা পড়িল এবং রেজিয়ার হারি হইল। বিদ্রোহী দলের কর্ত্তা আলটুনিয়া রেজিয়াকে কয়েদ করিয়া রাখিল তখন রেজিয়া আর কোন উপায় না দেখিয়া আলটুনিয়াকে বিবাহ করিলেন। যে আলটুনিয়া তাঁহার এত শত্রু ছিল সে আবার তখন তাঁহার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। বিপক্ষেরা আলটুনিয়া ও রেজিয়া দুই জনকেই মারিয়া ফেলিল। সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রেজিয়ার কপালে রাজ্য ভোগ হইয়াছিল।

নাসিরুদ্দীন।—রেজিযার পরে যে দুই জন রাজা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম না করিলেও চলে। তাহার পর আল্‌তমাসের পৌত্র নাসিরুদ্দীন রাজা হইলেন (১২৪৬ খৃঃ অঃ)। নাসিরুদ্দীনের যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার নাম বলবন। তিনি আবার আল্‌তমাসের জামাই। এখন বল দেখি, তাহা হইলে তিনি নাসিরুদ্দীনের কে? নাসিরুদ্দীনের মত ধার্ম্মিক ও সরল রাজা মুসলমানদের

মধ্যে খুব কম দেখা যায়। তিনি নিজের হাতে কেতাব নকল করিতেন এবং তাহা বেচিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই আপনার সংসারের খরচ চালাইতেন। তাঁহার রাণী একা রাঁধা বাড়া ও সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিতেন; একটী দাসীও ছিল না। একবার তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে একজন দাসীর জন্য বলিয়াছিলেন। সম্রাট অর্থাৎ রাজার রাজা নাসিরুদ্দীন তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, "রাজ্যের অর্থ আমার নিকট গচ্ছিত থাকে মাত্র, তাহা ভাঙ্গিয়া নিজের সুখের জন্য খরচ করিতে আমার কোনই অধিকার নাই।" তিনি বড়ই নিরহঙ্কার ও অমায়িক লোক ছিলেন। একবার তিনি নিজের হাতে লেখা একখানি বহি এক জন সভাসদ্‌কে দেখাইয়াছিলেন। সভাসদ্ কেতাবের অনেক ভুল দেখাইয়া দিলেন। সম্রাট তৎক্ষণাৎ সভাদের সম্মুখে কেতাবের সে সকল ভুল সংশোধন করিয়া লইলেন; কিন্তু যেই সে সভাসদ্ চলিয়া গেলেন অমনই তিনি সে সকল স্থান আবার কাটিয়া আগে যেমন ছিল তেমনই করিতে লাগিলেন। অন্যান্য লোক এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানিতাম আমার লেখা সমস্তই শুদ্ধ আছে; কিন্তু যখন এক জন ভাল ভাবিয়া সৎপরামর্শ দিতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে মনঃপীড়া না দিয়া তাহার কথা শোনাই ভাল।" আর কোন সম্রাট হইলে কি করিতেন বলিতে

পার? তাহার কথা শোনা তো দূরের কথা, হয়ত তাহার প্রাণটী লইয়াই টানাটানি বাধিত।

বলবন।—নাসিরুদ্দীনের ছেলে পিলে ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর সহজেই তাঁহার পিসা এবং মন্ত্রী বলবন সিংহাসনে উঠিলেন। এখন তাঁহার বয়স যাইট বৎসর। এত বুড়া বয়সেও এই সম্রাট যে প্রকার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা করিয়াছেন, না জানি আরও অল্প বয়সে রাজত্ব পাইলে তিনি আরও কত কি করিতেন! বলবনের বড় ছেলে মহম্মদ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার বড় অনুরাগ ছিল এবং তিনি সারাদিন পণ্ডিতদের সঙ্গেই থাকিতেন। এসিয়া মহাদেশের মধ্যে মোগল নামে এক দুর্দ্দান্ত জাতি আছে। সেই মোগলেরা এই সময়ে পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহাকে সকলেই ভাল বাসিত, এজন্য তাঁহার শোকে কাঁদে নাই এমন লোক রাজ্যে ছিল না। বৃদ্ধ বলবনের শরীর এই শোকে ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মরণাপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বাকারা খাঁ আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বলবন নিজের শরীরের অবস্থা ভাল নহে জানিতে পারিয়া বাকারা খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাকারা খাঁ আসিয়া বুঝিলেন, পিতার মৃত্যু হইতে এখনও দেরি আছে। অনর্থক বসিয়া

থাকিবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া বাকারা খাঁ আবার বাঙ্গলা মুলুকে ফিরিয়া গেলেন। তখন বলবন তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইলেন এবং ব্যবস্থা করিলেন যে, তিনি মরিয়া গেলে, মহম্মদের পুত্র সম্রাট হইবেন। বলবনের মৃত্যু হইলে সভাসদ্‌গণ বিবেচনা করিলেন রাজ্য লইয়া একটা বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা। তাঁহারা সকল দিক বজায় রাখিয়া বাকারা খাঁর পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসাইলেন। ছেলে সম্রাট হইলেন এবং তাঁহার বাপ বাকারা খাঁ ছেলের অধীনে শাশনকর্ত্তা হইয়া রহিলেন। এ কেমন উল্টা ব্যবস্থা দেখ দেখি!

কাইকোবাদ।—কাইকোবাদ যখন সিংহাসনে বসিলেন (১২৮৬) তখন তাঁহার বয়স মোটে আঠারো বৎসর। তিনি নানাবিধি আমোদে বড়ই মাতিয়া উঠিলেন। নিজামুদ্দীন নামে তাঁহার এক ধূর্ত্ত মন্ত্রী ছিল। কাইকোবাদকে ফাকি দিয়া আপনি রাজা হইবে ইহাই নিজামুদ্দীনের অভিপ্রায় ছিল। কাইকোবাদের পিতা বাকারা খাঁ বঙ্গদেশ হইতে সমস্ত সংবাদ জানিতে পারিয়া, একবার নিজের চক্ষে ছেলের অবস্থা দেখিবার নিমিত্ত দিল্লী আসিলেন। পিতার সহিত পুত্রের সাক্ষাৎ না হয় ইহাই মন্ত্রীর ইচ্ছা, সুতরাং যাহাতে উভয়ের দেখা শুনা না ঘটে, সে তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল; এমন কি, বাকারা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিল। তখন

আর কোন উপায় না দেখিয়া বাপ ছেলের সহিত দেখা করিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া লোক পাঠাইলেন। সে কথা শুনিয়া ছেলের মন গলিয়া গেল, তিনি বাপের সঙ্গে দেখা করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু খল কি কখন আপনার স্বভাব ছাড়ে। তখন সেই দুষ্ট মন্ত্রী বলিল, পিতা হইলে কি হয়, পুত্র যখন ভারতবর্ষের সুলতান তখন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, পিতাকেও অন্যান্য সামান্য লোকের মত, আদব কায়দা করিতে হইবে। পিতার পক্ষে এটা বড়ই অপমানের কথা। মন্ত্রী ভাবিল তাহা হইলেই বাকারা খাঁ ছেলের সহিত আর দেখা করিতে চাহিবেন না। কিন্তু ছেলের সহিত দেখা করিবার জন্য বাকারা খাঁর মন বড় ব্যাকুল। তিনি তখন কোন অপমানকেই অপমান মনে না করিয়া সকল কথাই স্বীকার করিলেন। কাইকোবাদ সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন, পিতা সম্মুখে আসিয়া অতি দূর হইতে বার বার নিয়মমত সেলাম করিতে লাগিলেন; তথাপি পুত্র একটু নড়িলেনও না দেখিয়া পিতার বড় কষ্ট হইল। তিনি তখন সেই সভামধ্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। হাজার হউক ছেলে তো! বাপের চক্ষে জল দেখিয়া কাইকো-বাদ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মন্ত্রীর পরা-মর্শ না শুনিয়া বেগে গিয়া পিতার চরণে পড়িবেন মনে করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, পিতাও অগ্রসর

হইয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং দুজনে পরস্পরের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাহার পর কাইকোবাদ পিতাকে সমাদরে সিংহাসনে বসাইলেন। বাকারা খাঁ কয়েক দিন দিল্লীতে থাকিয়া ছেলেকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। বুঝিলেন যে, ছেলে এই দুষ্ট মন্ত্রীর এমনই বশীভূত হইয়াছে যে, তাহার আর ভাল হওয়া অসম্ভব। ছেলের অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে ভাবিয়া বাকারা খাঁ আবার বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিলেন। পিতা চলিয়া গেলে কাইকোবাদ যাহা ছিলেন আবার তাহাই হইলেন। অত্যাচারে ও অনিয়মে তাঁহার বড় শক্ত রোগ জন্মিল এবং তিনি মরণাপন্ন হইয়া পড়িলেন। শেষে তাঁহার বিশ্বাস হইল যে মন্ত্রীর জন্যই তাঁহার এত সর্ব্বনাশ হইয়েছে। তখন তাহার হাত এড়াইবার আর কোন উপায় না দেখিয়া, বিষ খাওইয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও ভাল কিছুই হইল না, বরং বিশেষ মন্দই হইল। কাইকোবাদ নিজে রাজকার্য্যে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই মন্ত্রীর ভয়ে অন্য দুষ্ট লোকে এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারে নাই; এখন সকলেই চারিদিকে মাথা তুলিয়া উঠিল। অবশেষে খিলজি জাতীয় কতকগুলি লোক প্রবল হইয়া কাইকোবাদকে নিপাত করিল (১২৮৮) এবং জেলালউদ্দীন খিলজি

নামে একজনকে সিংহাসনে বসাইল। কুতবউদ্দীনের স্থাপিত দাস-বংশ এইখানে ফুরাইল। ইহার পর যে বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল, তাহার নাম খিল্‌জি বংশ।

খিল্‌জি বংশ।

জেলালউদ্দীন।—সোত্তর বৎসর বয়সে জেলালউদ্দীন খিল্‌জি দিল্লীর সুলতান্ হইলেন (১২৮৮)। কাইকোবাদের পুত্রকে তিনি কৌশল করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন,—এটি বড় অন্যায় কার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন বোধ হয়। যখন রাজত্ব পান নাই, তখন তিনি রাজসভায় যেরূপ স্থানে ও যেরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এখন নিজে সুলতান্ হইয়াও সেইরূপ স্থানে ও সেইরূপ ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যেমন ব্যবহার করিতেন, এখনও ঠিক তেমনই করিতে লাগিলেন। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। একবার বলবনের এক ভাইপো বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। জেলালউদ্দীনের পুত্র সেই বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে বন্দী করিয়া আনিলেন। কিন্তু জেলাল-উদ্দীন তৎক্ষণাৎ সকলকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন যাহাতে সুখ-

সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আর একবার কয়েকজন লোক তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চক্রান্ত করিয়াছিল। তাহারা ধরা পড়িলে জেলালউদ্দীন তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিলেন। কিন্তু কুকুরকে নাই দিলে সে মাথায চডিযা বসে। অনেক লোকের অনেক অপরাধ ক্ষমা করায লোকেবা বড় মজা পাইয়া গেল—চাবিদিকে গোলযোগ ও বিদ্রোহ হইতে লাগিল। বিশেষ সাহস ও দক্ষতাব সহিত বৃদ্ধ জেলালউদ্দীন নিজে যুদ্ধযাত্রা কবিযা সকল বিদ্রোহ থামাইয়া ফেলিলেন এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনকে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিযুক্ত কবিলেন। ক্রমে আলাউদ্দীন অনেক সৈন্য সংগ্রহ কবিলেন এবং এ পর্য্যন্ত কোন মুসলমান বাজা যাহা করিযা উঠিতে পারেন নাই তিনি তাহাও কবিযা উঠিলেন। এত কাল মালব প্রদেশের দক্ষিণে সকল ভাগেই হিন্দুদের স্বাধীন রাজ্য ছিল, মুসলমানেবা তাহাব একটুও জয় করিতে পারেন নাই। আলাউদ্দীন কাহাকেও কোন কথাই না বলিয়া আপনার সৈন্য সঙ্গে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র নামক প্রদেশেব রাজধানী দেব-গিরি নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজা রামদেব কোন সংবাদই আগে জানিতে পাবেন নাই। তিনি অনেক যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু হাবিয়া গেলেন। তখন আলা-উদ্দীনকে অনেক ধনরত্ন দিয়া এবং আপনার রাজ্যের কিছু

অংশ ছাড়িয়া দিয়া তিনি এ দায় হইতে অব্যাহতি পাই-লেন। এদিকে জেলালউদ্দীন হঠাৎ ভাইপো কোথায় গেলেন জানিতে না পারিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার ভ্রাতৃ-পুত্র একটা রাজ্য জয় করিয়া অনেক ধন লইয়া ফিরিয়া আসিতে-ছেন, তখন তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। এমন সময় আলা উদ্দীন একজন চতুর লোকের দ্বারা জেলালউদ্দীনকে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, পিতৃব্যের অনুমতি না লইযা, যুদ্ধ করিতে যাওযায় তিনি বড় লজ্জিত হইয়াছেন, এজন্য এখন পিতৃব্যের নিকটে আসিতে তাঁহার সাহস ও ভরসা হইতেছে না। আলাউদ্দীন যে লোক পাঠাইয়াছিলেন তাহার চাতুরীতে ভুলিযা বৃদ্ধ জেলালউদ্দীন নিজে গিয়া ভাইপোর সহিত দেখা করিতে স্বীকার করিলেন। তাহার পর তিনি সৈন্য সামন্ত পিছনে রাখিযা ভাইপোর নিকটে আসিলেন। তখন আলাউদ্দীন তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। যে খুড়া তাঁহাকে নিজের ছেলের মত ভাল ভাসেন সেই খুড়াকে আলাউদ্দীন অবিশ্বাস করিয়াছেন বলিয়া, জেলালউদ্দীন ভাইপোকে নিন্দা করিতে করিতে, স্নেহের সহিত, তাঁহার গালে টোকা মারিতে লাগিলেন। এদিকে আলাউদ্দীন নিকটেই কয়েকজন খুন করিবার জন্য লোক লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ইসারা করিবামাত্র তাহারা আসিয়া বৃদ্ধ, নিরপরাধী জেলাল-

উদ্দীনের বুকে ছোরা মারিয়া তাঁহাকে বধ করিল (১২৯৫)। তাহার পর তাঁহার কাটামুণ্ড একটা বর্ষার আগায় লাগাইয়া নগরের ভিতরে রাস্তায় রাস্তায় লইয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কি ভয়ানক ব্যাপার! শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ধন, মান ও ক্ষমতার লোভে মানুষ এমন অন্যায় কর্ম্ম করে যে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়!

আলাউদ্দীন।—আলাউদ্দীন দিল্লী আসিবামাত্র (১২৯৫) জেলালউদ্দীনের মহিষী আপনার কোলের ছেলে লইয়া পলাইয়া গেলেন। জেলালের আর এক পুত্র মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যে লোক এত পাপ করিয়া সিংহাসনে উঠিয়াছে সে কোন দিকে কাঁটা রাখে কি? আলাউদ্দীন জেলালউদ্দীনের দুই পুত্রকেই কৌশলে নিপাত করিলেন এবং মহিষীকেও কয়েদ করিয়া রাখিলেন। আলাউদ্দীন যেরূপ জঘন্য উপায়ে সিংহাসনে উঠিয়াছিলেন, সোলিমান নামে তাঁহার এক ভাইপোও সেইরূপ উপায়ের চেষ্টায় ছিলেন এবং কাজ প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। একদিন আলাউদ্দীন রাজধানী হইতে অনেক দূরে মাঠের মধ্যে শীকার করিতেছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে দুই তিন জন মাত্র লোক ছিল। এমন সময়ে কয়েকজন লোক সঙ্গে লইয়া সোলিমান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আলাউদ্দীনের মনে কোন সন্দেহ হইবার পূর্ব্বেই সোলিমানের

লোকেরা আলাউদ্দীনকে এমন তীব মারিল যে তিনি অচৈতন্য হইয়া মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন। ব্যস্তবাগীশ সোলিমান শেষ না দেখিয়াই মনে করিল যে খুড়ার মৃত্যু হইয়াছে। তখন বেগে অশ্ব চালাইয়া যেখানে আলাউদ্দীনের সৈন্য ছিল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়া দিয়া নিজে রাজা হইযা বসিল। সোলিমান খুড়ার উপযুক্ত ভাইপো সন্দেহ নাই; তবে খুড়া ভাইপোয় ফলেব বিস্তব তফাৎ দাঁড়াইল। সোলিমান যখন এদিকে সিংহাসনে বসিয়া আহ্লাদে আট খানা হইয়া ফাটিতেছেন, তখন ওদিকে ধীবে ধীরে আলাউদ্দীনের চৈতন্য হইল। তাঁহাব সঙ্গীবা তাঁহার ক্ষত বেশ করিয়া বাঁধিযা দিলে, তিনি ঘোড়ায় চড়িযা একটা উচ্চ স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সৈন্যেবা তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং চিনিতে পারিয়া তাঁহার পক্ষে আসিযা যোগ দিল। সোলিমান এই সংবাদ পাইয়া প্রাণের ভয়ে দৌড় মারিলেন। কিন্তু তখন পলাইয়া আর রক্ষা আছে কি? তিনি ধরা পড়িলেন এবং সৈন্যেরা তাঁহার কাটামুণ্ড আলাউদ্দীনের নিকট আনিয়া দিল; আর যাহারা এই পরামর্শের মধ্যে ছিল তাহাদের সকলেরও মাথা কাটা গেল। এই সময়ে দিল্লী নগরে একজন ধনী লোকের হাজীমৌলা নামে এক ক্রীতদাস ছিল। সামান্য ক্রীতদাস হইলেও তাহাব সাহস দেখিয়া বলিহারি দিতে হয়। সে কতকগুলা লোক জুটাইয়া

একজন নূতন লোককে সিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিয়া দিবার উদ্যোগ করে। তাহার কেবল মুখের উদ্যোগ নহে; সে সত্য সত্যই দিল্লী অধিকার করিয়াছিল। একজন রাজকর্ম্মচারী এই সময়ে হাজীকে মারিয়া না ফেলিলে আলাউদ্দীনের সিংহাসনে হাজীমৌলা আর একজনকে বসাইয়াছিল আর কি! হাজী, সে যাহাকে রাজা করিতে চাহিয়াছিল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লোকের প্রাণ গেল। হাজী যে ধনী লোকের ক্রীতদাস ছিল, এই উপলক্ষে নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন কেন যে তাঁহার বাটীর সমস্ত স্ত্রী, পুরুষ ও ছেলে মেয়েকে কাটিয়া ফেলিলেন তাহা বুঝিয়া উঠা ভার।

ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানা প্রদেশ রাজপুত জাতির বাসস্থান। এই রাজপুতানার মধ্যে মিবার নামক অংশের রাজগণের নাম রাণা বা মহারাণা। আর সকল রাজপুত অপেক্ষা মহারাণাগণের মান খুব বেশী। চিতোর নগরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই সময়ে ভীম সিংহ সেখানকার মহারাণা ছিলেন। তাঁহার পদ্মিনী নামে এক পরমা সুন্দরী রাণী ছিলেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সেই জন্য চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধে বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন আলাউদ্দীন একবার পদ্মিনীকে দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাণা তাহাতে সম্মত হইলেন না।

তাহার পর আলাউদ্দীন বলিলেন, পদ্মিনীকে সম্মুখে দেখিতে না পাইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আরসী পাতিয়া তাহার নিকটে আড়াল দিয়া পদ্মিনী দাঁড়াইলে, সেই আরসীতে তাঁহার যে ছায়া পড়িবে, সে ছায়া দেখিতে পাইলেও তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু সেই ছায়া দেখার পর পদ্মিনীকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এবং যখন ভীমসিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার ছাউনীতে আসিলেন তখন দুষ্ট আলাউদ্দীন তাঁহাকে কয়েদ করিয়া ফেলিয়া প্রকাশ করিলেন যে, যদি পদ্মিনী তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য একবার তাঁহার ছাউনিতে আইসেন, তাহা হইলেই ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। শঠের সহিত শঠতা করাই উচিত মনে করিয়া, রাজপুতগণ স্বীকার করিলেন যে, পদ্মিনী দেখা করিতে আসিবেন। আলাউদ্দীন সংবাদ পাইলেন একশত ডুলিতে চড়িয়া পদ্মিনী ও তাঁহার সখীগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, তাঁহার আহ্লাদের সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে একশত কাপড়-ঢাকা ডুলি ছাউনির মধ্যে আসিল, কিন্তু তাহার ভিতর হইতে পদ্মিনী, কি আর কোন মেয়ে মানুষ বাহির হইলেন না; বাহির হইল গোঁপ দাড়ীওয়ালা, ঢাল তলোয়ার হাতে, বড় বড় রাজপুত বীর। তাহারা খুব কাটাকাটি করিয়া শেষে হারিয়া গেল। তখন আলাউদ্দীন বিষম যুদ্ধ বাধা-

ইয়া চিতোর একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত বীরেরা যুদ্ধে মারা পড়িলেন। পদ্মিনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা তখন, পাছে মুসলমানদের হাতে পড়িতে হয় এই ভয়ে, এক ভয়ানক কাণ্ড করিলেন। তাঁহারা রাজবাটীর মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে সেই আগুনে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন! এই কার্য্যের নাম জহর। ইহার পূর্ব্বে ও পরে রাজপুত মেয়ে মানুষেরা আপনাদের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য এমন কাণ্ড কতবার করিয়াছেন! এই ঘটনার অনেক দিন পরে হাম্বির নামক রাজপুত বীর আবার চিতোর স্বাধীন করিয়াছিলেন।

গুজরাটের রাজার সহিত আলাউদ্দীন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি হারিয়া পলাইয়া যাইবার সময় দেবল দেবী নামে আপনার মেয়েকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাণী কমলা দেবী পলাইয়া যাইতে পারেন নাই। আলাউদ্দীন গুজরাট হাতে পাইয়া রাণী কমলাদেবীকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করেন। অনেক দিন পরে দক্ষিণ দেশে, ইলোরার গুহার নিকটে, আলাউদ্দীনের এক সেনাপতি দেবল দেবীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন এবং দিল্লীতে আলাউদ্দীনের নিকট পাঠাইয়া দেন। সেখানে আবার কিছু দিন পরে আলাউদ্দীনের পুত্র খিজর খাঁ দেবল দেবীকে বিবাহ করেন। তখন যে কমলা দেবী তাঁহার মা, তিনি

আবার তাঁহার শাশুড়ীও হইলেন। এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরেই আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয় (১৩১৬)।

মোবারিক।—আলাউদ্দীনের মন্ত্রী কাফুর রাজ্য আপনার হাতে রাখিবার জন্য প্রথমটা বড় গোল করিয়াছিল এবং দুই জন রাজপুত্রের চক্ষু উপড়াইয়া দিয়াছিল। শেষে সে মারা পড়িলে আলাউদ্দীনের আর এক ছেলে মোবারিক সিংহাসনে উঠিলেন (১৩১৭)। তিনি কোনই কাজের লোক ছিলেন না, বাড়ার ভাগ আলাউদ্দীনের মতই নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি এমনই নীচ লোক ছিলেন যে কতকগুলি সামান্য নাচ-ওয়ালীর সঙ্গে নিজেও তাহাদের মত মেয়ে মানুষ সাজিয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী নাচিয়া বেড়াইতেন। তিনি এইরূপে নাচিয়া ও নেশা করিয়া কাল কাটাইতেন; কাজেই মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার ছিল। এ মন্ত্রী বড় ভয়ানক লোক। সে হিঁদুর ছেলে ছিল; তাহার পর নিজের ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া খসরু নামে বিখ্যাত হয়। কয়েকজন সভাসদকে সে অকারণে বধ করে; বাকী সভাসদেরা তাহার ভয়ে কাজ ছাড়িয়া দিলেন। "চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া," তাহাতে খসরু খাঁর আরও সুবিধা হইল। সে তখন মোবারিককে মারিয়া ফেলিয়া (১৩২১) নিজে সিংহাসনে বসিল। আলাউদ্দীনের পরিবারবর্গের মধ্যে যেখানে যে বাঁচিয়া ছিল এই নরাধম সে সকলকে মারিয়া ফেলিল এবং বিধবা দেবল দেবীকে জোর করিয়া

বিবাহ করিল। এই সময়ে পঞ্জাবে গাজি খাঁ টগলক নামে একজন উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি খসরু খাঁর এই সকল অত্যাচার দেখিয়া আপনার সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিলেন। তাঁহার হাতেই এই নরাধমের লীলা খেলা ফুরাইল, লোকেও মহানন্দিত হইল। দিল্লী প্রবেশ করিয়া গাজি খাঁ বলিলেন যে, তিনি নিজে রাজ্য লইতে ইচ্ছা করেন না। যদি খিলজি বংশের কেহ কোথাও বাঁচিয়া থাকে তবে তাহাকেই তিনি সিংহাসনে বসাইতে চাহেন। কিন্তু খসরু খাঁ কি আর কোথায় কাহাকে রাখিয়াছিল? কাহাকেও পাওয়া গেল না দেখিয়া তখন গাজি খাঁ ঘিয়াসউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। খিলজি বংশের এই খানে শেষ হইল। তাহার পর যে বংশের রাজত্ব চলিতে আরম্ভ হইল তাহার নাম টগলক বংশ।

টগলক বংশ।

ঘিয়াসউদ্দীন।—ঘিয়াসউদ্দীনের পিতা প্রথমে বলবনের ক্রীতদাস ছিলেন। সেই দাসপুত্র এক্ষণে বলবনের সিংহাসনে রাজ্যেশ্বর হইয়া বসিলেন (১৩২১)। ঘিয়াসউদ্দীনের সময়ে রাজ্যে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই—প্রজারা ছিল ভাল। তিনি একবার বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। বলবনের পুত্র এবং কাইকোবাদের পিতা বাকারা

খাঁর কথা তোমাদের মনে আছে বোধ হয়। সেই বৃদ্ধ এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া বাঙ্গলা দেশ শাসন করিতেছিলেন। কত কাণ্ডই তাঁহার চক্ষের সম্মুখে হইল, তিনি সেই দূর দেশে বসিয়া কত গোলমালই দেখিতেছিলেন! আপনার পিতরা মৃত্যু হইল, পুত্র শত্রুর হাতে মারা পড়িলেন, নিজে যে বংশের রাজকুমার সে বংশের শেষ হইয়া গেল, তাহার পর নূতন এক বংশের একে একে তিন জন রাজা হইলেন, তাহার পর সে বংশ ফুরাইল; আবার এখন এক নূতন বংশের প্রথম রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। কালের কি অদ্ভুত খেলা! যে এক সময়ে পিতার দাস-পুত্র ছিল, সে আজি প্রভু-পুত্রের প্রভু হইল। ঘিয়াসউদ্দীন বঙ্গদেশ হইতে ফিরিবার সময়ে রাজধানীর নিকটে আসিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খাঁ তাঁহাকে অতি সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। এই জন্য তিনি এক প্রকাণ্ড কাঠের বাড়ী তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ঘিয়াসউদ্দীন ও তাঁহার আর এক ছেলে সেই বাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠের অট্টালিকা পড়িয়া গেল এবং ঘিয়াস ও তাঁহার ছেলে চাপা পড়িয়া মরিয়া গেলেন (১৩২৫)। ঘিয়াসের বড় ছেলে জুনা খাঁ সে সময়ে সেখানে ছিলেন না, সুতরাং তিনি বাঁচিয়া গেলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, লোকে কিন্তু ইহা জুনা খাঁরই কার্য্য বলিয়া মনে করে।

মহম্মদ।—সুলতান মহম্মদ নাম ধারণ করিয়া জুনা খাঁ খুব ধূমধামের সহিত সিংহাসনে বসিলেন (১৩২৫)। তাঁহার অনেক গুণ ছিল। তিনি অনেক বিদ্যা জানিতেন, ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ভক্তি ছিল, এবং যুদ্ধে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এক ফোঁটা চোনা পড়িয়া এক কলসী দুধ মাটি হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল না; তাঁহার কাজ সকল বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার পাগলের ছিট্ ছিল। একবার তাঁহার মনে খেয়াল হইল, পারস্য দেশ জয় করিতে হইবে। সে জন্য লক্ষ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করা হইল। এত সৈন্যের মাহিয়ানা যোগান তো সহজ কথা নহে। দিন কতক পরে তিনি আর তাহাদের বেতন দিয়া উঠিতে পারিলেন না। তখন তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দেশ লুটপাট করিয়া খাইতে লাগিল। এই খেয়ালে মহম্মদের যত টাকা ছিল সকলই ফুরাইয়া গেল; কাজেই টাকার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি মনে করিলেন চীন রাজ্যে অনেক টাকা আছে; ঐ দেশ জয় করিতে পারিলে সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। তখন চীন মারিয়া লইবার জন্য, হিমালয়ের উপর দিয়া, লক্ষ সৈন্য পাঠাইলেন। সৈন্যেরা পথের কষ্টেই আধ-মরা হইল এবং তাহাদের সঙ্গে যে খাদ্য ছিল তাহাও ফুরাইল। এই অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা বিপক্ষের বিস্তর সৈন্য দেখিয়া বড়ই

ভয় পাইল এবং, যুদ্ধ তো দূরের কথা, কোন ক্রমে পলায়ন করাই তাহারা সৎপরামর্শ মনে করিল। ফিরিয়া আসিবার সময় বিপক্ষেরা অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহাদের তাড়াইয়া আসিল এবং অনেককে কাটিয়া ফেলিল। তাহার পর পথে পর্ব্বতের লোকেরাও অনেককে মারিয়া ফেলিল এবং খাইতে না পাইয়াও অনেকের প্রাণ গেল। শেষে এমন হইল যে দেশে ফিরিয়া আসিয়া এ দুঃখের কথা গল্প করিবার লোকটীও থাকিল না। যে কয়েকজন এত কষ্টেও বাঁচিয়া ছিল, তাহাদিগকেই সকল অনিষ্টের মূল মনে করিয়া, মহম্মদ তাহাদের মারিয়া ফেলিলেন। এই তো মহম্মদের চীন জয়ের বৃত্তান্ত। একেই ভয়ানক টাকার টানাটানি বাধিয়াছিল, তাহার উপর আবার এই পাগলামিতে বিস্তর টাকা উড়িয়া গেল, সুতরাং অভাব আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন মহম্মদ কাগজের টাকা চালাইবেন স্থির করিলেন; কিন্তু তাঁহার কাগজের টাকা চলিল না। কি ব্যবসাদার, কি মহাজন কেহই কাগজের টাকা লইতে চাহিল না। এদিকে দেশের লোকেরা নানা প্রকারে জ্বালাতন হইয়া বনে গিয়া বাস করিতে লাগিল। পাগল রাজা চটিয়া লাল হইলেন এবং প্রজাদের শাস্তির জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা শুনিলেও হৃৎকম্প হয়। রাজারা বনের ব্যাঘ্র ভল্লুক, মহিষ, হরিণ প্রভৃতি শীকার করিয়া থাকেন। নিষ্ঠুর সুলতান মহম্মদ

সেইরূপে মানুষ শীকার করিবেন স্থির করিলেন। অনেক সৈন্য লইয়া সুলতান মহম্মদ এক একটা বন ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যেরূপে বনের পশু শীকার করা হয় সেইরূপেই, বনে যে সকল মানুষ গিয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনি দেবগিরি নগরে রাজধানী করিবার ইচ্ছায় দুই বার দিল্লীর সমস্ত প্রজাকে সেখানে গিয়া বাস করিতে হুকুম দেন: দুই বারই তাহাদিগের ফিরিয়া আসিতে হয়। ইহাতে লোকের বড় ক্লেশ হইয়াছিল। এইরূপ অবিবেচনায় ও অত্যাচারে চারি দিকে বিদ্রোহ হইতে লাগিল এবং কোন কোন স্থান স্বাধীন হইয়া উঠিল। সেই সকল বিদ্রোহের জন্য তাঁহার অনেক কষ্ট করিতে হইল। অবশেষে (১৩৫১) মহম্মদের মৃত্যু হইল।

ফিরুজ।—মহম্মদের ভাইপো ফিরুজ সিংহাসনে বসিলেন (১৩৫১)। ইনি রাজ্যের অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন এবং প্রজাদের নানাপ্রকারে সুখী করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন বয়সে ফিরুজের মৃত্যু হয় (১৩৮৮)।

নাসিরুদ্দীন।—ফিরুজের মৃত্যুর পর দুই বৎসর রাজ্য লইয়া অনেক মারামারি কাটাকাটি হয়। তাহার পর তাঁহার পুত্র নাসিরউদ্দীন রাজত্ব পাইলেন (১৩৯০)। তিনি চারি বৎসর রাজ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (১৩৯৪)।

মাহমুদ।—নাসিরউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার এক ছেলে মোটে পঁয়তাল্লিশটী দিন রাজত্ব করিয়া মরিয়া যান। তাহার পর মাহমুদ সিংহাসনে বসিলেন (১৩৯৪)। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষের এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। তুর্কিস্থান দেশে তাইমুরলঙ্গ নামে একজন দুর্দ্দান্ত লোকের জন্ম হয়। নানা দেশ লুটপাট করা ও মানুষ মারাই ইঁহার কার্য্য ছিল। ইঁহার অনেক সৈন্য ছিল, এজন্য কেহই ইঁহাকে পরাজয় করিতে পারিত না। ইনি অন্যান্য দেশ লুট করিয়া ভারতবর্ষে আইসেন এবং ইঁহার আগমনে এ দেশের যে সর্ব্বনাশ হয় তাহা আর বলিবার নহে। মুলতান হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে এদেশের অনেক নগর পোড়াইয়া ছারখার করিতে করিতে, লোক সকলকে কাটিতে কাটিতে, মানুষের রক্তে দেশ ভাসাইতে ভাসাইতে, এই রাক্ষস দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যখন যে পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন, তখন তাহার নিকটের লোকেরা আপনাদের ঘর দ্বার ফেলিয়া যে যেখানে পাইল প্রাণের ভয়ে পলাইতে লাগিল। তিনি যখন দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন, কেহ কেহ বলেন তখন তাঁহার সহিত এক লক্ষ বন্দী ছিল। নিষ্ঠুর তাইমুর দিল্লী আসিয়া অকারণে সেই এক লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট করিলেন। তিনি আসিবামাত্র মাহমুদ দিল্লী ছাড়িয়া

গুজরাটে পলাইয়া গেলেন। সহজেই দিল্লী তাইমুরের হাতে পড়িল। তাহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল তাহা বলিতেও ভয় হয়। তাঁহার সৈন্যেরা দিল্লী লুট করিতে গিয়া যে যত পারিল লুট তো করিল, বাড়ার ভাগ মানুষ মারিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিল। মনুষ্যের দেহে দিল্লীর পথ সকল পূরিয়া গেল, নগরময় রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল। এত বড় সহর একেবারে মনুষ্যহীন হইয়া গেল। তাহাতেই কি সর্ব্বনাশের শেষ হইল, তাহা নহে। তাহার পর তাইমুরের সৈন্যেরা নগরে আগুন লাগাইয়া দিল—দিল্লী হুহু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এদিকে যখন এই সর্ব্বনাশ হইতেছিল তখন তাইমুর কি করিতেছিলেন জান? তিনি তখন নগরের বাহিরে সাদা পাথরের যে মসজিদ্ আছে তাহাতে বসিয়া দিল্লী জয়ের জন্য আল্লার প্রশংসা করিতে করিতে এই সকল কাণ্ড দেখিতেছিলেন! তিনি যে দেশের লোক সেই দেশের ভাষায় তাইমুর শব্দের অর্থ লোহ। তাঁহার গুণের মতই নাম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। লোহা-নহিলে মানুষের মন কি এত শক্ত হয়? তিনি একটু খোঁড়া ছিলেন, তাই তাঁহাকে লঙ্গ অর্থাৎ খোঁড়া বলিত। সকল বিষয়েই কানা খোঁড়ার এক গুণ বেশী; নিষ্ঠুরতার বেলাতেও হয়ত তাই। তাহার পর দিল্লী ত্যাগ করিয়া এবং পথে আর দুই একটী নগরের এমনই

করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া, সেই পিশাচ এ দেশ হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেন বটে কিন্তু এ দেশের যে সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? মরা পচিয়া চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ হইল এবং সেই দুর্গন্ধে নানা প্রকার পীড়া ও মহামারী উপস্থিত হইল। তিনি লোক মারিয়া গেলেন ও টাকা-কড়ি লুটিয়া লইলেন। কাজেই তখন দেশে চাষ করিবার চাষা নাই, ব্যবসা করিবার দোকানদার নাই, সুতরাং ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িল। যাহারা তাঁহার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারাও এইরূপে মারা যাইতে লাগিল। সকলের উপর বিপদ—দেশে ঘোর অরাজক উপস্থিত হইল। তাইমুর চলিয়া গেলে দুর্ব্বল মাহমুদ টগলক আবার দেখা দিলেন বটে, কিন্তু তখন যে আইসে সেই রাজা। তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইল (১৪১২)। খিজর খাঁ নামক পঞ্জাব প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আসিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। টগলক বংশ ডুবাইল। তাহার পর সায়দ বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

সায়দ বংশ।

সায়দ বংশ।—খিজর খাঁর পরে এই বংশের আর তিন জন রাজা ক্রমে ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন।

তাঁহারা সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু দিল্লী ছাড়া আর কোন রাজ্য লাভ করিতে পারিলেন না। চারিদিকেই বিদ্রোহ হইতে লাগিল। শেষে বেহলুল লোদী নামে এক বলবান ব্যক্তি আসিয়া শেষ সায়দ রাজাকে দূর করিয়া দিয়া (১৪৫০) নিজে রাজা হইয়া বসিলেন। সায়দবংশের পর লোদী বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

লোদী বংশ।

বেহলুল।—দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া (১৪৫০) বেহলুল নিজের ক্ষমতায় অনেক দূর পর্য্যন্ত রাজ্য বাড়াইয়া ফেলিলেন।

সেকেন্দর।—বেহলুলের মৃত্যুর পর (১৪৮৮) সেকেন্দর সিংহাসন লাভ করিলেন। ইনি রাজ্যের সীমা আরও বাড়াইয়াছিলেন।

ইব্রাহিম।—সেকেন্দরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম রাজা হইলেন (১৫১৬)। ইনি সিংহাসনে বসিয়া নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অনেকেই বড় ভীত হইল এবং অনেক স্থানের শাসনকর্ত্তা স্বাধীন হইয়া উঠিল। এই সময়ে বাবর নামে একজন

মুসলমান কাবুল প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁ, ইব্রাহিমের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, এই বাবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাবর তৎক্ষণাৎ সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন এবং লাহোর জয় করিয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর অনেক স্থান জয় করিয়া তাইমুরের ন্যায় সে সকল স্থানে বিস্তর মানুষ মারিলেন। হঠাৎ এক বার আপনার রাজ্যে ফিরিয়া যাওয়ার আবশ্যক হওয়ায়, তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন। শীঘ্রই পুনবার এদেশে অসিয়া একেবারে দিল্লীর দিকে আসিতে লাগিলেন, এদিকে ইব্রাহিমও তাঁহাকে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। পথে পাণিপথ নামক স্থানে দুই দল সৈন্যের দেখা হইল। ইব্রাহিমের সৈন্য বাবরের অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, বাবর নিজে খুব পাকা যোদ্ধা ছিলেন। ইব্রাহিমের হারি হইল এবং তিনি ও তাঁহার বিস্তর সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন (১৫২৬)। লোদী বংশের শেষ হইল। একটা চলিত কথা আছে জান কি? "মোগল পাঠান হদ্দ হলো পার্সি পড়ে তাঁতি।" এত দিন যত মুসলমান রাজা এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা পাঠান। এখন অবধি যাঁহারা রাজ্য আরম্ভ করিলেন তাঁহাদের নাম মোগল। এই সকল রাজাদের ভাষার নাম পার্সি।

এই জন্যই যাহার যে কাজ সে তাহা না করিয়া, যাহা পারিবে না তাহাতে হাত দিলে, লোকে ঐ কথা বলিয়া তাহাকে তামাসা করে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাবর।

মোগল সাম্রাজ্যের আরম্ভ।—বাবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন (১৫২৬)। দুর্দ্দান্ত তাইমুরের বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার মাতা মোগল ছিলেন বলিয়া ইঁহার বংশাবলী মোগল নামেই খ্যাত। দিল্লীর পরেই বাবর আগ্রা অধিকার করিলেন এবং এক স্থানের পর আর এক স্থান করিয়া ক্রমেই নূতন রাজ্য বাড়াইতে লাগিলেন। তখন ভারতবর্ষে মুসলমানেরা তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু হিন্দুরা তাহা করিল না। বাবর তাইমুরের ন্যায় দেশ জয় করার পর ফেলিয়া চলিয়া গেলেন না। তিনি এখানে বসিয়া রাজত্ব করিবেন-স্থির করিলেন।

হিন্দুদের যুদ্ধ।—তোমরা আলাউদ্দীনের রাজত্বের বিবরণে রাজপুতানার মধ্যস্থিত মিবার প্রদেশ ও তাহার রাজধানী চিতোর নগরের কথা পাঠ করিয়াছ। আলা-উদ্দীন চিতোর ছারখার করিয়া দেওয়ার কিছুকাল পরে হামির তাহা আবার অধিকার করেন, একথা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। সেই হামিরের বংশের যে রাজা এক্ষণে মিবারে রাজত্ব করিতেছিলেন তাঁহার নাম মহারাণা সংগ্রাম সিংহ। এই রাজা যেমন বীর ছিলেন, ইঁহার তেমনই মান ছিল। ইনি বাবরকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য আগ্রার দিকে আসিতে লাগিলেন। বাবরও আপনার সৈন্য সামন্ত লইয়া ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। আগ্রার নিকটে শিক্রী নামক স্থানে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল এবং সেখানে যুদ্ধ বাধিয়া গেল, এই যুদ্ধে মহারাণার জয় হইল এবং বাবরের বিস্তর সৈন্য মারা পড়িল। পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল, কিন্তু বাবরের সৈন্যেরা যুদ্ধে হারিয়া বড় ভয় পাইয়াছিল, এজন্য তাহাদের অনেকেই আবার সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধের নাম শুনিয়া পলাইয়া গেল। বাবরও মনে মনে ভয় পাইয়াছিলেন বোধ হয়। যাহা হউক, আবার যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত লইয়া বাবর শিক্রীতে উপস্থিত হইলেন এবং আবার দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। পুনরায় রাণা

সংগ্রামসিংহেরই জয় হয় হয় হইয়া উঠিল; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার এক জন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির নষ্টামিতে সকলই মাটী হইয়া যায়। এই সেনাপতি যুদ্ধের মাঝামাঝি যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়া বাবরের দিকে আসিয়া যোগ দেয়। যাহা হউক এবার যুদ্ধে সংগ্রাম-সিংহের পরাজয় হইল এবং তিনি পর্ব্বতের মধ্যে লুকাইয়া থাকিলেন। যুদ্ধে তাঁহার শরীরের অনেক স্থানে বড় আঘাত লাগিয়াছিল এবং তাঁহার অনেক সাহসী যোদ্ধা মরিয়া গিয়াছিল। এই যুদ্ধের পর তিনি আর নিজের রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন না; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন এই মোগল শত্রুকে পরাজয় করিতে না পারিবেন ততদিন আর রাজ্যে ফিরিবেন না; কিন্তু শীঘ্রই মৃত্যু ঘটায় তাঁহার সকল বাসনার শেষ হইয়া গেল। যদি অসময়ে তাঁহার জীবনের শেষ না হইত তাহা হইলে হয়ত এই বীরের ক্ষমতায় ভারতবর্ষে আবার হিন্দু রাজত্বের উন্নতি হইত এবং ভারতের আশা ত্যাগ করিয়া মোগলদের পলায়ন করিতে হইত।

মৃত্যু।—বাবর অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। অতিরিক্ত মদ খাওয়ায় তাঁহার নানাপ্রকার কঠিন পীড়া জন্মিল এবং অবশেষে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে (১৫৩০) আগ্রা নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

———

হুমায়ুন।

রাজ্যারম্ভ।—বাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন বাদশাহ হইলেন (১৫৩০)। কিন্তু কিছুকাল পরেই শির খাঁ নামে এক ব্যক্তি এমনি বিভ্রাট বাধাইয়া দিল যে হুমায়ুনের, রাজ্য করা দূরে থাকুক, এদেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। নিম্নে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

শির খাঁর বিবরণ।—শির খাঁ বেহার প্রদেশের এক জন সামান্য জমিদারের ছেলে। বাবর যখন যুদ্ধ যাত্রা করিতেছিলেন তখন শির খাঁ তাঁহার সহিত মিলিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। বাবর তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেহারের মধ্যে এক সম্মানিত পদ প্রদান করিলেন। তাহার পর নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতায় শির খাঁ বেহারের মধ্যে বড়ই প্রভুত্ব করিয়া ফেলিলেন এবং, হুমায়ুন বাদশাহ হওয়ার কিছুদিন পরেই, তিনি চুনার নামক স্থানের কেল্লা দখল করিয়া লইলেন; তখন ক্রমে সমস্ত বেহার তাঁহার অধীন হইয়া পড়িল। এইরূপে সামান্য লোক শির খাঁ একটা রাজ্য দখল করিয়া বসিলেন।

বাদশাহের সহিত বিরোধ।—বাদশাহ হুমায়ুন দেখিলেন শীঘ্র শির খাঁকে দমন না করিলেই নয়। তিনি

আসিয়া চুনার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া লইলেন, কাজেই বেহার শির খাঁর হাতছাড়া হইয়া গেল। চতুর শির খাঁ তখন বাঙ্গলা প্রদেশের রাজধানী গৌড় নগর অধিকার করিলেন। তাঁহার হাত হইতে বেহার বাহির হইয়া গেল, কিন্তু বাঙ্গলা দেশ হাতে আসিল। হুমায়ুন তখন শির খাঁকে বাঙ্গলা হইতে তাড়াইবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং সহজেই গৌড় নগর অধিকার করিলেন। এদিকে শির খাঁ আসিয়া আবার চুনার দুর্গ, সমস্ত বেহার প্রদেশ এবং কাশী পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন; আর কনোজ নগর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ সৈন্য দিয়া ছাইয়া ফেলিলেন। হুমায়ুন মহা গোলে পড়িয়া রহিলেন। যে পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে তাহা শত্রুরা ঘেরিয়া আছে। তাহাতে আবার তখন দারুণ বর্ষাকাল, বাঙ্গলা দেশের বিল, খাল, নদী সকলই জলে জলময়। অনেকদিক কাটিয়া গেল, আর থাকিলে চলে না ভাবিয়া, হুমায়ুন বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিলেন।

বাদশাহের সহিত যুদ্ধ।—হুমায়ুন কাশীর নিকটে পৌঁছিলে একদিন শেষ রাত্রে শির খাঁ আপনার দলবল লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কে কোথায় পলায় তাহার ঠিকানা নাই। নিজে হুমায়ুন প্রাণের দায়ে একটা ঘোড়ায় চড়িয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সোয়ার সমেত সাঁতার দিয়া নদী পার হওয়া

সহজ নয় তো; ঘোড়া মাঝ-গঙ্গায় গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ডুবিয়া গেল। তখন বাদশাহ মারা যান আর কি! ভাগ্যক্রমে সেই সময় একজন ভিস্তিওয়ালা আপনার ভিস্তির উপরে ভর দিয়া নদী পার হইতেছিল। সে খালি ভিস্তির ভিতর বাতাস পূরিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়াছিল; কাজেই ভিস্তি ফুলিয়া জলে বেশ ভাসিতে-ছিল। সে বাদশাহের এই দুর্গতি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের ভিস্তিতে আশ্রয় দিল এবং পার করিয়া আনিল। ভিস্তি-ওয়ালার কৃপায় বাদশাহ এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। বাদশাহের তখনকাব মত বিপদ কাটিয়া গেলে, এই ভিস্তি-ওয়ালা আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিযাছিল। তখন বাদশাহ তাহাকে, কয়েক ঘণ্টার জন্য, সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, আপন সিংহাসনে বসিতে দিয়াছিলেন। শুনা যায়, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই, ভাগ্যবান ভিস্তিওযালা আপ-নাব এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য বিলক্ষণ সংস্থান করিযা লইয়াছিল। সে যাহা হউক, হুমায়ুন তো কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া ফিবিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৈন্যেরা প্রায় সকলেই মারা পড়িল। হুমায়ুন পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে রাণী ছিলেন তিনি শির খাঁর হাতে পড়িলেন। শির খাঁ তাঁহার সহিত কোন প্রকার অভদ্রতা না করিয়া, নিজের লোক সঙ্গে দিয়া, তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

পুনরায় যুদ্ধ।—আবার এক বৎসর ধরিয়া আয়োজন করিয়া হুমায়ুন যুদ্ধে নামিলেন। এবারেও তাঁহার ভয়ানক পরাজয় হইল এবং তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি বাধিল। বড় আঘাত লাগায় তাঁহার ঘোড়া একবার অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। দৈবাৎ একটা হাতী জুটিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহার উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং গঙ্গায় জলে হাতী নামাইয়া দিলেন। বিষম গোল—মাহুত আবার ছাই এই বিপদের সময়ে হাতী চালাইতে চাহে না। তখন, মাহুতকে ঠেলা মারিয়া গঙ্গাব জলে ফেলিযা দিয়া, হুমায়ুন তাহার স্থানে আর একজন লোক বসাইয়া দিলেন। অপর পারে নদীর পাহার খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। হস্তী কোন মতেই সে স্থান দিয়া উপরে উঠিতে পারিল না। এদিকে বিপক্ষেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, তিনি তখন মারা যান আর কি! দুই জন সৈনিক কোন উপায়ে নদী পার হইয়াছিল। তাহারা বাদশাহের এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া আপনাদের মাথার পাগ্‌ড়ি খুলিয়া যোড়া লাগাইল এবং একদিক বাদশাহের কাছে ফেলিয়া দিয়া অপর দিক আপনারা ধরিয়া থাকিল। হুমায়ুন সেই কাপড় চাপিয়া ধরিলে সৈন্য দুইজন টানা হেঁচড়া করিয়া কষ্টে হৃষ্টে তাঁহাকে উপরে তুলিল; তখন তিনি কায়ক্লেশে আগ্রায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

বাদশাহের পলায়ন।—তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, না পলাইলে এখন আর নিস্তার নাই। তখন আগ্রা ও দিল্লী হইতে সঙ্গে লইবার মত দামী দামী জিনিষ পত্র ও মেয়ে মানুষদের সঙ্গে লইয়া হুমায়ুন পলায়ন করিলেন। কামরাণ নামে তাঁহার এক ভাই লাহোরে শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই নিকটে আশ্রয় লইবেন মনে করিয়া তিনি লাহোরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু হুমায়ুনের নাকি এখন কপাল ভাঙ্গিয়াছে, এখন আর কিছুতেই ভাল হইবার নহে। কামরাণ মনে করিলেন, ভাই তো এখন নিজে রাজ্যহারা, এখানে থাকিয়া শেষে হয়ত আমার রাজ্য টুকু লইয়াই টানাটানি করিবেন; না হয়ত শির খাঁ, শত্রু আমার নিকটে আছে জানিয়া, আমাকেও আক্রমণ করিবে। এই সকল মনে করিয়া, তিনি আপনার রাজ্য শিব খাঁকে দিয়া, কাবুলে চলিয়া গেলেন।

আশ্রয়ের চেষ্টা।—হুমায়ুন তখন নিরুপায় হইয়া সিন্ধু প্রদেশে গেলেন। সেখানেও তাঁহার থাকিবার স্থান হইল না। তাহার পর মনে করিলেন রাজপুতানার মধ্যে মারবার প্রদেশের রাজা মালদেবের নিকট হয়ত আশ্রয় পাইতে পারিবেন। পথে ভয়ানক মরুভূমি; সেই মরুভূমি পার হইয়া আসিতে তাঁহার সঙ্গের অনেক লোক মরিয়া গেল। এত কষ্ট করিয়া আসিয়াও হিতে

বিপরীত হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, মালদেব তো তাঁহাকে আশ্রয় দিবেনই না, বাড়ার ভাগ যদি তাঁহাকে হাতে পান তাহা হইলে শির খাঁর হাতে ধরিয়া দিবেন। মহাবিপদ! তখন আবার সেই মরুভূমি পার হইয়া, অমরকোট নামক স্থানের রাজার নিকট যাইবেন স্থির] করিলেন। পথে জল-বিন্দুটী পর্য্যন্ত নাই—কেবল আগুনের মত বালি চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে। কষ্টের সীমা রহিল না। এইরূপ অবস্থায় রাজা মালদেবের পুত্র তাঁহাকে একদিন আক্রমণ করিল এবং তাঁহার সঙ্গের কতকগুলি লোককে মারিয়া ফেলিল। বাকি সকলকে গরু তাড়ান গোছ করিয়া, সেই মরুভূমির মধ্য দিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। হুমায়ুন হিন্দু রাজার অধিকারে প্রবেশ করিয়া গোহত্যা করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই অপরাধের জন্য এই শাস্তি হইল। শাস্তি যথেষ্ট হইয়াছে দেখিয়া শত্রুরা তাঁহাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিল এবং তাঁহাদের শীতল জল পান করিতে দিল। যাহা হউক, এত কষ্টের পর অমরকোটে আসিয়া হুমায়ুন আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলেন। সেখানকার রাজা রাণা-প্রসাদ তাঁহাকে অতি সমাদরে আশ্রয় দিলেন।

আকবরের জন্ম।—যিনি এক সময়ে রাজার রাজা ছিলেন; লোকের ধন, মান, প্রাণ এক সময়ে যাঁহার ইচ্ছার অধীন ছিল; তিনি আজি সামান্য ব্যক্তির মত

প্রাণের ভয়ে পলাতক—দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের ভিখারী। এই দুঃসময়ে হুমায়ুনের এক পুত্র সন্তান হইল। আকবর নামে হুমায়ুনের এই পুত্র ভবিষ্যতে সম্রাট হইয়া রাজ্যের অতিশয় গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হুমায়ুনের এক্ষণে যদি এরূপ দুর্দশা না হইত, তাহা হইলে পুত্র জন্মিলে, না জানি, কতই সমারোহ হইত। দান উপহার ইত্যাদির জন্য, না জানি, কত টাকাই খরচ হইয়া যাইত! কিন্তু অদৃষ্টের এমনই খেলা, যে বাদশাহ হুমায়ুন, ছেলে হইয়াছে খবর পাইয়া, দেখিলেন এমন কিছুই নাই যাহা আনন্দ করিয়া লোকদিগকে দিতে পারেন। তাঁহার কাছে কেবল একটি মৃগনাভি ছিল। তিনি সেইটী ভাঙ্গিয়া তাহার দুই একটী করিয়া দানা পার্শ্বস্থ সকল লোকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন, মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় তাঁহার পুত্রের যশও যেন জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রায় ঠিক ফলিয়াছিল।

ভারতবর্ষ ত্যাগ।—এখানে থাকিতে থাকিতে কোন কারণে রাণা-প্রসাদের সহিত একটু মনের অমিল হইল এবং আরও এমন সকল ঘটনা ঘটিল যে, হুমায়ুন ভারত-বর্ষের মায়া ত্যাগ করা আবশ্যক মনে করিলেন। মির্জ্জা আস্কারি নামে তাঁহার এক ভাই কান্দাহারের রাজা ছিলেন। হুমায়ুন সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। কান্দাহারের নিকটস্থ হইলে একজন অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে

সংবাদ দিল, যে মির্জ্জা আস্কারি তাঁহাকে কয়েদ করিতে আসিতেছেন। তখন তাড়াতাড়ি হুমায়ুন ও তাঁহার মহিষী এক ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহারা, তাহার খুড়া যাহা ইচ্ছা হয় করিবে মনে করিয়া, আপনাদের শিশু সন্তানকে ফেলিয়া গেলেন। মির্জ্জা আস্কারি শিশু ভাইপোকে আদর করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন। এদিকে হুমায়ুন ক্রমে ক্রমে পারস্য দেশের রাজধানী হিরাট নগরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি তো এই অবস্থায় থাকিলেন, এক্ষণে ভারতবর্ষে কি হইতে লাগিল বলি শুন।

সুর-বংশ।

শির খাঁ।—আপনার ক্ষমতায় রাজ্য লাভ করিয়া শির খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে উঠিলেন (১৫৪০)। ইতিহাসে তাঁহার বংশাবলী সুর-বংশ নামে খ্যাত। তিনি একে একে হুমায়ুনের সমস্ত রাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু রাই-সিন নামে একটী হিন্দু দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি তাহার লোকদের সহিত বড় অন্যায় অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। সন্ধি হইয়াছে জানিয়া তাহারা যখন যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ত্যাগ করিয়াছে, তখন কথা নাই বার্ত্তা নাই, শির তাহাদের সকলকে নিরপরাধে

কাটিয়া ফেলিলেন। তাইমুরের আক্রমণের পর অকারণে এরূপ নিষ্ঠুরতার কথা আর শুনা যায় নাই। জগদীশ্বর এই অত্যাচারের ফল হাতে হাতেই দিয়াছিলেন। পর বৎসর কালঞ্জর আক্রমণ কবিতে আসিয়া যখন তিনি আপনার বারুদ ও গোলা গুলি তদারক করিতেছিলেন সেই সময়ে শত্রু পক্ষের কোন লোক তাঁহার বারুদে আগুন ধরাইয়া দেয়; সেই বারুদ জ্বলিয়া শিরের সর্ব্ব শরীর পুড়িয়া যায়. এবং কয়েক ঘণ্টা কাল যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া তাঁহার প্রাণ বাহির হয় (১৫৪৫)। এত কষ্ট করিয়া যে রাজ্যলাভ হইল, পাঁচ বৎসরেব অধিক তাহা তাঁহার অদৃষ্টে ভোগ হইল না।

সেলিম।—শিরের পুত্র সেলিম সিংহাসনে উঠিলেন এবং নয় বৎসর রাজ্য করিয়া মরিয়া গেলেন (১৫৫৩)।

মহম্মদ আদিল।—তাহার পর মহম্মদ আদিল সিংহাসনে বসিলেন (১৫৫৩)। ইনি যে পাপ করিয়া সম্রাট হইলেন তাহা আর বলিবার নহে। সেলিমের মৃত্যু হইলে তাঁহার বারো বৎসরের ছেলে সিংহাসন পাইলেন। মহম্মদ আদিল সেই ছেলের আপনার মামা। বলিলে প্রত্যয় যাইবে না, এই মাতুল রাজ্যলোভে আপনার এই ভাগিনেয়কে মারিয়া ফেলিল। বালক তখন আপনার মায়ের কোলে বসিয়াছিল, পাষণ্ড মামার তথাপি কোন দয়া বা চক্ষুলজ্জা হইল না। সে আপনার ভগ্নীর কোলেই

আপনার ভাগিনেয়ের বুকে ছোরা মারিয়া মারিয়া ফেলিল। মহম্মদ আদিল ঘোর মূর্খ ও নিতান্ত মন্দ স্বভাবের লোক ছিল। হেমু নামে একজন হিন্দু তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিল। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে সামান্য দোকানদারি করিত এবং ইহার চেহারা বড় মন্দ ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়; তাহার অনেক গুণ ও ক্ষমতা ছিল। সম্রাট নিজে যেরূপ মন্দ লোক ছিলেন তাহাতে কেহই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না; কাজেই চারিদিকে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। একা হেমু কতদিক ঠেকাইবে? এদিকে আবার সময় বুঝিয়া, হুমায়ুনও সৈন্য সামন্ত লইয়া আপনার রাজ্য পুনরায় অধিকার করিতে আসিলেন। তাঁহাব পুত্র আকবরের সহিত যুদ্ধে হেমু হারিয়া গেল ও প্রাণ হারাইল। মহম্মদ আদিল পলায়ন করিল; পরে একজন চক্রান্ত করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল (১৫৫৬)।

হুমায়ুনের দ্বিতীয় রাজত্ব।

কামরাণের শাস্তি।—ষোল বৎসর রাজ্যহীন থাকিয়া, নানারূপ কষ্ট পাওয়ার পর, হুমায়ুন আবার ভারতবর্ষেব সম্রাট হইলেন (১৫৫৫)। তিনি যখন পুনরায় ভারত-বর্ষে আইসেন তখন তাঁহার ভাই কামরাণ বার বার বড়ই শত্রুতা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন প্রথম প্রথম তাঁহাকে

দয়া করিয়া ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ বার তাঁহাকে ধরিয়া যেরূপ শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা মনে হইলেও গা শিহরিয়া উঠে। তিনি কমরাণকে কাণা করিয়া দিবার আজ্ঞা দিলেন। একজন লোক তখন বার বার ছুরির খোঁচা দিয়া কামরাণের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। তিনি বিনা শব্দে সে কষ্ট সহ্য করিলেন। তাহার পর যখন সেই ক্ষতবিক্ষত চক্ষু দুইটির মধ্যে লেবুর রস ঢালিয়া দিল, তখন কামরাণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হে ভগবন, ইহকালে অমি যত পাপ করিয়াছি তাহার ঢের সাজা হইল, এখন পরকালে যেন তোমার দয়া পাই!" তাহার পর তিনি মক্কা গমন করিলেন ও সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

মৃত্যু।—এত কষ্টের পর রাজ্য লাভ হইল বটে, কিন্তু হুমায়ুনের কপালে তাহা বেশী দিন ভোগ হইল না। ছয় মাসের মধ্যেই তিনি একদিন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন। বড় চকচকে পাথরের সিঁড়ি। তাঁহার হাতে একগাছি ছড়ি ছিল, তিনি যেমন সেই ছড়িতে ভর দিয়াছেন অমনই ছড়ি সরিয়া গেল এবং তিনি পড়িয়া গেলেন। তখনই তাঁহার মূর্চ্ছা হইল; খানিক ক্ষণ পরে আবার তাঁহার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা আর ভাল হইল না। তিন দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৫৫৬)।

আকবর।

আকবরের রাজ্যারম্ভ।—হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আকবর সম্রাট হইলেন (১৫৫৬)। তখন ইঁহার বয়স তেরো বৎসর চারি মাস মাত্র। বয়স অল্প হইলেও তাঁহার সাহস ও বুদ্ধি অল্প ছিল না। বাইরাম খাঁ নামে তাঁহার পিতার একজন বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন। আকবর ছেলেমানুষ বলিয়া সেই বাইরাম খাঁর হাতেই সমস্ত রাজকার্য্যের ভার থাকিল; আকবর কেবল নামে বাদশাহ হইলেন।

বাইরাম খাঁ।—শির খাঁ হুমায়ুনের রাজ্য কাড়িয়া লইলে যখন তিনি দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যান তখনও বাইরাম তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন নাই। পুনরায় রাজ্য পাওয়ার সময়েও বাইরাম বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বাদশাহ হুমায়ুন তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর বাদশাহ হইলে বাইরাম যাহা করিতেন তাহাই হইত; আকবর কেবল স্বাক্ষিগোপাল হইয়া রহিলেন বই নয়। কিন্তু বাইরামের কতকগুলি মহৎ দোষ ছিল এবং সেই জন্যই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। তিনি বড় দুর্ম্মুখ, রাগী ও গোঁয়ার লোক ছিলেন। আকবরকে একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, তিনি যাহা মনে হইত তাহাই করিয়া ফেলিতেন।

এই সকল কারণে সভার সকল লোক তাঁহার উপর বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং আকবরও কিসে এই মন্ত্রীর হাত এড়াইতে পারেন তাহাব উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাইরাম তো চালাক কম ছিলেন না; তিনি কি জানি কখন কি ঘটে ভাবিয়া, যখন যেখানে যাইতেন আকবরকে সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না। এক তো আকবর ছেলে মানুষ, তাহার উপব বাইরাম রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা; কাজেই তাঁহাব হাত ছাড়াইযা উঠা আকবরের পক্ষে সহজ নহে। বুদ্ধিব সাগর আকবব তখন সভাসদ্‌গণেব সহিত ভিতরে ভিতরে একটা পবামর্শ ঠিক করিলেন। তাহার পর বাইবামের সহিত দিল্লী ছাড়িয়া অনেক দূরে শীকার কবিতে গিয়া, হঠাৎ মাতার কঠিন পীড়াব ওজর করিয়া, বাজধানীতে ফিবিয়া আসিলেন। মন্ত্রী থাকিলেন তফাতে পড়িযা, আকবর তখন একা, আব তাঁহাকে পায় কে? তিনি তখনই প্রচার করিয়া দিলেন, এখন হইতে রাজকার্য্য সমস্ত তিনি নিজে করিবেন এবং তাঁহাব হুকুম ছাড়া কোন কাজ হইতে পারিবে না। বাইরামের মাথায় তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বাদশাহের অনুগ্রহের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, আর কি কিছু হয? বাদশাহ তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিলেন এবং ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু সে সকল কিছু না করিয়া বাই-

রাম কতকগুলি সৈন্য লইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ নিজে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন এবং তাঁহাকে হারাইয়া দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বাইরাম খাঁ বাদশাহের শরণাগত হইবেন স্থির করিলেন। তিনি যতই অন্যায় করুন, আকবর তাঁহার গুণের কথা ভুলেন নাই। বাইরাম আসিতেছেন শুনিয়া বাদশাহ কয়েক-জন প্রধান সভাসদ্‌কে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সম্মানের সহিত আনিতে পাঠাইলেন। বাইরাম আসিয়া আকবরের পদতলে পড়িয়া গেলেন এবং কাঁদিতে লাগিলেন। অতি সদাশয় আকবর তখনই তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। তাহার পর তাঁহাকে এক বিশেষ সম্ভ্রম সূচক পোষাক পরাইয়া বলিলেন, হয় কোন এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, না হয় রাজসভায় কোন এক প্রধান কর্ম্ম, আর না হয় সম্মানের সহিত রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া মক্কাতীর্থে গমন, এই তিনের মধ্যে তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই বাদশাহ করিয়া দিতে সম্মত আছেন। বাইরাম মক্কায় যাইতেই সম্মত হইলেন। তখন আকবর তাঁহার খরচের জন্য মাসিক অনেক টাকা পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি মক্কায় যাইবার জন্য গুজরাট পর্য্যন্ত গমন করিলেন, এমন সময়ে একজন আফগান আসিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল।

এই ব্যক্তির পিতাকে বাইবাম খাঁ বধ করিয়াছিলেন, সে আজি তাহার শোধ তুলিয়া গেল।

বিদ্রোহ।—আকবর তো আঠারো বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেন, কিন্তু তাহাতে আপাততঃ চারিদিকে বড় গোল বাধিয়া উঠিল। কোন কোন রাজ্যের শাসনকর্ত্তা এবং বাদশাহের কোন কোন কর্ম্মচারী মনে করিল, যাহাব ভয় ছিল সে বাইরাম তো এখন নাই; আর বাদশাহও ছেলে মানুষ। এ সময়ে খুব পাকাপাকি করিয়া বিদ্রোহ করিলেই স্বাধীন হইয়া উঠা যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু বয়সে বালক হইলেও আকবরের সাহসের অভাব ছিল না। সাহসে ভর কবিয়া এবং কোন বিপদকেই বিপদ মনে না করিয়া তিনি একে একে সকল বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিলেন।

রাজ্য বিস্তার।—ভারতবর্ষেব প্রায় সকল অংশই আকবর অধীন করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান সম্রাট এমন করিয়া রাজ্য বাড়াইতে পারেন নাই। যে রাজপুতজাতি কাহারও নিকট মাথা নোয়ায় না, তাহারাও আকবরের অধীন হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—তাহাদের মধ্যে কোন কোন রাজা আকবরের সহিত আপনাদের মেয়ের বিবাহ দিয়া কুটুম্বিতা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। মুসলমান হইয়া, হিন্দুর ইচ্ছামতে, হিন্দুর মেয়ে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন বিবাহ করিতে পায়

নাই। জোর করিয়া যদি কেহ কখন বিবাহ করিয়া থাকেন, সে স্বতন্ত্র কথা। রাজপুত জাতির মধ্যে কেবল মিবার রাজ্যের মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবরের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই এবং তাঁহার সঙ্গে কোন কুটুম্বিতাও করেন নাই। আকবর তাঁহাকে পরাজয় করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তোমরা পূর্ব্বে যে রাণা সংগ্রাম-সিংহের কথা পড়িয়াছ, এই প্রতাপসিংহ তাঁহারই পৌত্র।

চাঁদ সুলতানা।—আকবরের সৈন্যেরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে রাজ্য বাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিতে গেলে আহমদনগর নামক স্থানের রাণী চাঁদ বিবি, বা চাঁদ সুলতানা বড় সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মেয়ে মানুষ হইয়া তিনি যে সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন, অনেক পুরুষ বীরও তাহা পারেন না। তিনি পুরুষের মত সকল অঙ্গ বর্ম্মে ঢাকিয়া, মুখে ঘোমটা দিয়া এবং হাতে খোলা তরবারি লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজ হস্তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার নিজের দলের সৈন্যেরাই তাঁহার উপর রাগ করিয়া অসময়ে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল।

শাসন।—আকবর রাজ্য-শাসনের বড়ই সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানে তিনি কোন প্রভেদ

করিতেন না। উপযুক্ত হিন্দুদের তিনি বড় বড় রাজপদে বসাইতেন। ভগবান দাস, মানসিংহ, টোডর মল্ল, আবুল ফজেল, ফৈজি প্রভৃতি ভারী ভারী বিচক্ষণ লোক তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এত বড় রাজ্যের হিন্দু মুসলমান সকল রকম প্রজাই তাঁহাকে ভাল বাসিত ও ভক্তি করিত। তাঁহার বীরত্বের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের সহিত খেলা করিতেন, পাগলা হাতীর উপরে চড়িতেন, ক্রমাগত দুই চারি দিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে পারিতেন, এবং প্রতিদিন কুড়ি পঁচিশ ক্রোশ পায়ে হাঁটিতেন। তিনি যেমন বীর, তেমনই বিদ্যানুরাগী, তেমনই সদাশয় ও তেমনই বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহার শাসন-কালে ভারতবর্ষের সকল বিষয়েই অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম হইলে হুমায়ুন কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন মনে আছে তো? এখন দেখ সে আশীর্ব্বাদ ফলিয়াছিল কি না। তাঁহার যশের সীমা ছিল না। এ দেশের লোক তাঁহাকে ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিয়া বলিত, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"; ইউরোপের লোক তাঁহার নাম রাখিয়াছিল, "মহৎ মোগল।"

মৃত্যু।—পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করার পর আকবরের কঠিন পীড়া হইল এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬০৫)। তাঁহার অন্যান্য পুত্র পূর্ব্বেই

মরিষা গিয়াছিল, কেবল সেলিম নামে এক পুত্র বাঁচিয়া ছিলেন। এই পুত্রের সহিতও তাঁহাব ইদানীং কিছু মনান্তর জন্মিয়াছিল। এক্ষণে পিতার মৃত্যু সময়ে সেলিম আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আকবর সন্তুষ্ট মনে পুত্রেব হস্তে বাজ্য সমর্পণ কবিযা প্রাণত্যাগ কবিলেন।

জাহাঙ্গীর।

পিতাপুত্রের যুদ্ধ।—যেই আকবরেব মৃত্যু হইল সেই সেলিম জাহাঙ্গীব নাম ধাবণ কবিযা সিংহাসনে বসিলেন (১৬০৫)। জাহাঙ্গীবেব খসরু নামে এক পুত্র ছিলেন ; সেই খসরুর মনে সম্রাট হইবাব জন্য বড লোভ হইল। তিনি পিতাব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত কবিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাব পক্ষে একটু সুবিধা হইল বটে, কিন্তু শেষ বক্ষা হইল না ; তিনি ও তাঁহাব সাত শত জন সঙ্গী ধবা পড়িলেন। বাদশাহ সেই সাত শত জন অনুচবকে সারি বাঁধিযা শূলে দিলেন, তাহাবা যাব-পর-নাই যন্ত্রণা ভোগ কবিযা প্রাণত্যাগ কবিল। তাহারা যখন যাতনায় বিষম আর্ত্তনাদ কবিতেছে, সেই সময়ে খসরুকে তাহাদের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল। তাহাদের সেই কষ্ট দেখিয়া, বিশেষতঃ তাঁহাবই জন্য

তাহাদের এই দুর্দ্দশা এ কথা মনে করিয়া, খস্রুর হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহার পর অনেক দিন শোকে অতিশয় কাতর ছিলেন এবং তিন দিন অন্ন জল মুখেও দেন নাই।

নুরজেহান।—সম্রাট হওয়ার ছয় বৎসর পরে জাহাঙ্গীর নুরজেহান নামে এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। এই নুরজেহানের বৃত্তান্ত বড় আশ্চর্য্য। পারস্য দেশে মির্জা গায়স নামে একটী লোক ছিলেন। তাঁহার অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশে থাকিয়া দিন যায় না দেখিয়া, তিনি আপনার পরিবার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিবেন স্থির করিলেন। পথে আসিতে আসিতে এক ভারী বিপদ উপস্থিত হইল, এই দুঃসময়ে পথের মাঝখানে গায়সের স্ত্রীর এক কন্যা জন্মিল। তাঁহাদের তখন দুরাবস্থার সীমা নাই। কন্যাকে একটু দুধই বা দেন কোথা হইতে, লইয়াই বা যান কেমন করিয়া কিছুই তাঁহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহারা কন্যাকে পথের মাঝখানে ফেলিয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়া এক দল বণিক আসিতেছিল। পরে যিনি ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হইলেন তিনি তখন সেই পথের ধারে পড়িয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। দিব্য গোলাপ ফুলের মত মেয়েটী দেখিয়া একজন বণিকের মনে বড় দয়া হইল। তিনি

মেয়েটিকে কুড়াইয়া লইলেন এবং আপনার মেয়ের মত করিয়া মানুষ করিবেন স্থির করিলেন। মেয়ের জন্য একজন ধাত্রীর আবশ্যক। সে পথে তখন ধাই কিরূপে পাওয়া যাইবে? খানিক দূরে আসার পর মেয়ের মাকে দেখিতে পাইয়া বণিক তাঁহাকেই ধাই নিযুক্ত করিলেন। তখন তাঁহার নিকট বণিক সকল কথা জানিতে পারিলেন এবং সকলকে খরচ দিয়া সঙ্গে করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। সেখানে সেই বণিকের যত্নে গায়স ও তাঁহার পুত্র বাদশাহ আকবরের নিকট পরিচিত হইলেন এবং উপযুক্ত কর্ম্ম পাইলেন। সেই মেয়ের তখন নাম হইল মেহেরউন্নিসা।

নুরজেহানের প্রথম বিবাহ।—যত বয়স বাড়িতে লাগিল ততই মেহেরউন্নিসার রূপ বাড়িতে লাগিল। তাঁহার মাতা কখন কখন বাদশাহের অন্তঃপুরে যাইতেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কন্যাও যাইতেন। সেই সময়ে সেলিম তাঁহাকে বড় সুন্দরী দেখিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে কাহারও ইচ্ছা না হওয়ায়, আকবর বাদশাহের পরামর্শ মতে, সের আফগান নামক একজন বীরের সহিত মেহেরউন্নিসার সম্বন্ধ স্থির হইয়া বিবাহ হইয়া গেল। সের আফগান বর্দ্ধমানে এক কর্ম্ম পাইলেন এবং মেহেরউন্নিসাকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া আসিলেন।

নুরজেহানের বৈধব্য।—সেলিম বাদশাহ হইয়াই

মেহেরউন্নিসাকে কাড়িয়া আনিয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কুতব নামক একজনের উপর এই কার্য্যের ভার দিয়া বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। কুতব আসিয়া সের আফগানের নিকট এই কথা বলিলে সের কুতবের বুকে ছোরা মারিয়া মারিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তখনই কুতবের লোকেরা সেরকেও মারিয়া ফেলিল। তখন বিধবা মেহেরউন্নিসাকে দিল্লীতে ধরিয়া আনিল এবং জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। যে ব্যক্তি বিনা দোষে তাঁহার স্বামীকে বধ করিয়াছে, বিবাহ করা দূরে থাকুক, মেহেরউন্নিসা তাহার সহিত কথা কহিতেও সম্মত হইলেন না।

বাদশাহের সহিত নুরজেহানের বিবাহ।—কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া যাওয়ার পর মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন। মহা সমারোহে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। তখন তাঁহার নাম হইল নুরজেহান। বিবাহের পর হইতে নুরজেহানই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিলেন। জাহাঙ্গীর নামে বাদশাহ রহিলেন মাত্র; সকল বিষয়েই নুরজেহানের যাহা মত ও ইচ্ছা বাদশাহ তাহাই করিতেন। নুরজেহান তখন আপন পিতাকে আনিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাইলেন এবং ভাইকেও এক বড় কর্ম্ম দিলেন। দেখ কি অদ্ভুত কাণ্ড! যাহার জন্ম হইলে বাপ মা বিব্রত হইয়া পথে ফেলিয়া গিয়াছিল,

পরের দয়ায় যে প্রাণ পাইয়াছে, সে আজি কত রাণীর রাণী হইল—এত বড় রাজ্যের সর্ব্বেশ্বরী হইয়া বসিল !

স্যর টমাস্ রো।—জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডে যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার নাম জেমস্। এই নামে ইংলণ্ডে পরে আর একজন রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে প্রথম জেমস্ বলা হয়। এই প্রথম জেমস্ রাজা, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট এক দূত পাঠাইয়াছিলেন, সেই দূতের নাম স্যর টমাস্ রো। তিনি বাদশাহের ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমক দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং তাহার অনেক বর্ণনা লিখিয়াছেন।

বাদশাহ বন্দী।—নুরজেহানের সাহস ও বুদ্ধি কেমন অদ্ভুত, তাহার একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছি। মহাবত খাঁ নামে এক ব্যক্তি পূর্ব্বে আকবর বাদশাহের সময়ে সেনাপতি ছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে তিনি ধনে মানে পদে ক্রমে ক্রমে অন্য সকল লোকের অপেক্ষা বড় হইয়া উঠেন। নুরজেহানের যতই গুণ থাকুক, একটী বড় দোষ ছিল, তিনি অন্য কোন লোকের বিশেষ সম্মান বা ক্ষমতা দেখিলে বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হইতেন। কাজেই মহাবতের সর্ব্বনাশ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তাঁহার যাহা ইচ্ছা বাদশাহেরও তাহাই ইচ্ছা। বাদশাহ তখন মহাবতের কতকগুলি দোষ ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাবত বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বনাশ

শিয়রে। রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি তখন এক বিষম কাণ্ড বাধাইয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর কাবুল যাইতে-ছিলেন, পথে একটা নদীর ধারে ছাউনি করিয়া তিনি রাত্রি কাটাইতেছিলেন। নদীর উপব গায়ে গায়ে নৌকা লাগাইয়া সাঁকো করা ছিল; সেই সাঁকোর উপর দিয়া বাদশাহের সৈন্যেরা অগ্রে পার হইয়া গেল। জাহাঙ্গীরের নিকট কেবল আবশ্যকমত কয়েকজন লোক থাকিল। সকলের যাওয়া হইলে এবং গোল চুকিয়া গেলে বাদশাহ নদী পার হইবেন স্থির ছিল। মহাবত এই সুযোগে, ভোর হইবার একটু আগে, সেই সাঁকোর ধারে দুই হাজার সৈন্য খাড়া করিয়া দিলেন। যাহারা ওপারে গিয়াছে তাহাদের এপারে আসিবার উপায় থাকিল না। তাহার পর মহাবত নিজে দুই শত সৈন্য লইয়া একেবারে বাদশাহের তাম্বুর ভিতরে উপস্থিত হইলেন। এত লোকের পায়ের শব্দে বাদশাহের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তরবারি হাতে কবিষা উঠিয়া পড়িলেন এবং বিশেষ রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"বিশ্বাসঘাতক মহাবত খাঁ! তোমার এই কাজ?" মহাবত মাটিতে মস্তক নত করিয়া মুখে অনেক বিনয় দেখাইলেন, কিন্তু আসল কাজ ভুলিলেন না। নানারূপ কৌশল করিয়া মহাবত বাদশাহকে হাতীতে চড়াইয়া আপনার তাম্বুতে লইয়া গেলেন। আপত্তি বা জোর করিলে তখন কোন ফল হইবে না বুঝিয়া মহাবতের

ইচ্ছাতেই বাদশাহকে চলিতে হইল। সুতরাং যিনি ভারত-বর্ষের সম্রাট তাঁহার সমস্তই তখন মহাবত খাঁর অধীন হইল।

নুরজেহানের বুদ্ধি।—যখন মহাবত বাদশাহকে এইরূপে বন্দী করিলেন তখন নুরজেহান অন্য তাম্বুতে ছিলেন। তিনি যখন এই বিপদের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন সামান্য মেয়ে মানুষের মত হা হুতাশ না করিয়া, তাঁহাকে কেহ চিনিতে না পারে এইরূপ এক পোষাক পরিলেন এবং একখানি অতি সামান্য ডুলিতে চড়িয়া নদীর ওপারে আপনাদের সৈন্য সামন্তের সহিত মিলিলেন। ওপারের লোক এপারে আসা বারণ ছিল, কিন্তু এপারের লোক ওপারে যাওয়ার বারণ ছিল না। কাজেই নুরজেহানকে কেহ চিনিতেও পারিল না, বারণও করিল না।

নুরজেহানের সাহস —পরদিন প্রাতে নুরজেহান আপনার সৈন্য সঙ্গে, হাতে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে চলিলেন। তিনি হাতীর উপর হাওদার মধ্যে বসিলেন, তাঁহার কোলে তখন তাঁহার একটী ছোট নাতিনী ছিল। তিনি নাতিনী কোলে করিয়া কতই যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না; যাড়ার ভাগ তাঁহার হাতীর মাহত মরিয়া গেল, তাঁহার নাতিনীর গায়ে একটা তীর লাগিল এবং তাঁহার হাওদায় তীর বিঁধিয়া সজারুর

মত হইল। হাতীর একে মাহুত নাই, তাহাতে আবার তাহার শুঁড়ে একটা আঘাত লাগিয়াছিল—সে বেগে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং অতি কষ্টে ওপারে পৌঁছিল।

নুরজেহানের কৌশল।—বলে কিছু হইবে না বুঝিয়া নুরজেহান তখন কৌশলেব দ্বারা স্বামীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সাহসে ভর কবিয়া মহাবতের ছাউনিতে উপস্থিত হইলেন এবং আপনিও স্বামীর সহিত মহাবতের হাতে বন্দিনী হইলেন। সেখানে থাকিযা তিনি বাদশাহকে নানা কৌশলের কথা শিখাইতে লাগিলেন। বাদশাহ সেই সকল কথা বলিয়া ক্রমে ক্রমে মহাবতকে এমনই করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে তিনি নিজে মহাবতের উপব বড়ই সন্তুষ্ট এবং তিনি এরূপে থাকিতে একটুও অনিচ্ছুক নহেন। মহাবত খাঁ এই সকল কথায খুব ভিজিয়া গেলেন। এই সময়ে মহাবতের সৈন্যদের মধ্যে একটা ঘরাও বিবাদ বাধিয়া অনেক লোক কাটাকাটি করিয়া মরিল। এদিকে নুরজেহানও ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিয়া চারিদিকে আপন পক্ষের লোক রাখিতে লাগিলেন। তাহার পর সময় বুঝিয়া সেই সকল লোক একদিন বাদশাহকে ঘিরিয়া ফেলিল—তাহারা বাদশাহের কাছে বিপক্ষের লোকদের ঘেঁসিতেও দিল না। এত গোলেব পর বাদশাহ নিষ্কৃতি পাইলেন। মহাবত

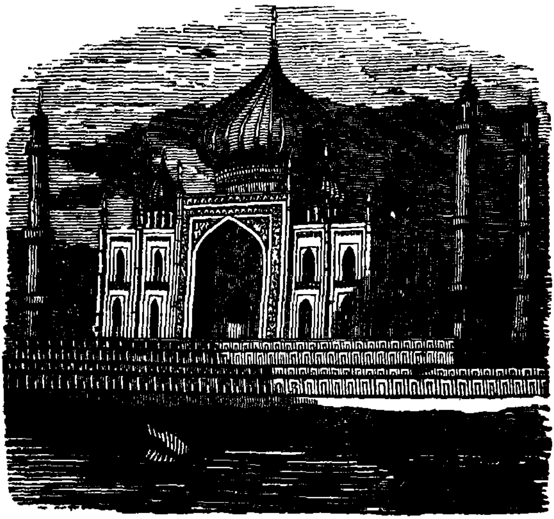
মনে করিলে যখন জাহাঙ্গীরকে হাতে পাইয়াছিলেন, তখনই তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিলে করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সকল তিনি কিছুই করেন নাই, ইহা তাঁহার ভদ্রতা এবং বাদশাহের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

মৃত্যু।—ষাইট্ বৎসর বয়সে জাহাঙ্গীর বাদশাহের মৃত্যু হইলে (১৬২৭)। স্বামীর মৃত্যুর পরেও নুরজেহান উনিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি আর কখন কোন রাজ কার্য্যে মিশেন নাই, কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দেন নাই, এবং রঙ্গীন কাপড় পরেন নাই।

শাহজেহান।

শাহজেহানের যুদ্ধ।—শাহজেহান সম্রাট হইয়া প্রথমেই আপনার ভাই ও ভাইপোদের যমালয়ে পাঠাইলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তিনি হীরা, মতি, চুনি, পান্না মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি জহরৎ বড় ভাল বাসিতেন। এই সকল জিনিষ তিনি এতই সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহার বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নানা প্রকার মহামূল্য মণি মাণিক্য দিয়া তিনি এক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই সিংহাসনের আকার ঠিক পেকমধরা ময়ূরের মত; এই জন্য তাহার নাম শিখি-সিংহাসন বা "ময়ূর-তক্ত"। কেহ কেহ বলেন তাহার দাম সাত কোটী টাকা।

প্রাসাদাদি।—শাহজেহান নানা প্রকার আশ্চর্য্য মসজিদ অর্থাৎ মুসলমানদের উপাসনা করিবার স্থান এবং আপনাদের থাকিবার জন্য অতি সুন্দর সুন্দর রাজ-বাটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সকলের মধ্যে যেটী সকলের অপেক্ষা ভাল তাহার নাম তাজমহল। শাহজে-হানের মমতাজমহল নামে এক মহিষী ছিলেন; তাঁহারই সমাধির জন্য এই বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার মত চমৎকার বাড়ী পৃথিবীতে আর নাই। আগরা নগরে যমুনা নদীর ধারে এ বাটী এখনও শোভা পাইতেছে।



তাজমহল।

বাদশাহের পীড়া।—নির্ব্বিঘ্নে উনত্রিশ বৎসর রাজ্য করার পর তাঁহার অত্যন্ত শক্ত পীড়া হইল এবং সেই জন্য যে সকল কাণ্ড ঘটিল, তাহা মনে হইলে শরীর কাঁপিয়া উঠে।

পুত্রগণের বিদ্রোহ।—শাহজেহানের চারি পুত্র,—দারা, সুজা, আউরঙ্গজিব ও মোরাদ। পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র পুত্রগণ প্রত্যেকেই বাদশাহ হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। বাঙ্গলা দেশের শাসনকর্ত্তা সুজা সৈন্য লইয়া রাজধানীর দিকে ছুটিলেন। গুজরাটের শাসনকর্ত্তা মোরাদও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সাজিলেন। দক্ষিণ দেশের শাসনকর্ত্তা আউরঙ্গজিব বড় ধূর্ত্ত ও ভারী বিট্‌লে। তিনি দেখিলেন একা যুদ্ধ করিয়া কিছু হইবে না; অতএব আর এক ভাইকে দলে লওয়া আবশ্যক। তিনি মোরাদকে অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন। আউরঙ্গজিব বুঝাইলেন যে, মোরাদই বাদশাহ হইবার ঠিক উপযুক্ত পাত্র এবং যাহাতে মোরাদ সম্রাট হইতে পারেন সেজন্য তিনি সকলই করিতে সম্মত আছেন; রাজ্য-সুখে তাঁহার একটুও মন নাই, যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবেন সে কয়দিন ফকির হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্মে কাটাইতেই তাঁহার মন। বোকা মোরাদ এই সকল কথায় ভিজিয়া গেল এবং সে আউরঙ্গজিবের দলেই মিশিল।

শাহজেহানের রাজ্যশেষ ও কয়েদ।—দারা এই গোলযোগের সময়ে রাজধানীতেই ছিলেন। তিনিও সৈন্য লইয়া প্রস্তুত থাকিলেন। এদিকে শাহজেহানের পীড়া ক্রমেই সারিতে লাগিল। তখন তিনি সুজাকে বাঙ্গলায় ফিরিয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন; কিন্তু তখন কাহার কথা কে শুনে? দারার পুত্র সোলেমান সৈন্য লইয়া সুজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল, সুজা হারিয়া গেলেন এবং বাঙ্গলায় পলাইয়া আসিলেন। এদিকে আউরঙ্গজিব ও মোরাদের দল যুদ্ধে বাদশাহের সৈন্যদের হারাইয়া দিল। তখন দারা নিজে এই দুই ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন; তাঁহার পরাজয় হইলে, তিনি আবার দিল্লীতে পলাইয়া আসিলেন। তাহার পর আউরঙ্গজিব আসিয়া অনেক ধূর্ত্ততা করিয়া বাদশাহকে কয়েদ করিয়া ফেলিলেন (১৬৫৮)। ইহার পরে শাহজেহান আরও সাত বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজত্ব এইখানেই ফুরাইল।

আউরঙ্গজিবের সিংহাসন লাভ।—তাহার পর আউরঙ্গজিব দেখিলেন আর মোরাদকে দরকার কি? এখন সে কণ্টক দূর করাই ভাল। এই ভাবিয়া তিনি একদিন মোরাদকে আপনার তাম্বুতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেখানে দুই ভাইয়ে খুব মদ খাইতে লাগিলেন। মোরাদ নেশায় অজ্ঞান হইয়া উঠিলেন। তখন আউরঙ্গজিব তাঁহার ঢাল তলোয়ার খুলিয়া লইয়া, হাতে পায়ে শিকল লাগাইয়া,

কন্ধেদে পাঠাইলেন। তাহার পর দিল্লী আসিয়া বিনা ব্যাঘাতে সম্রাট হইয়া সিংহাসনে বসিলেন।

আউরঙ্গজিব।



ভাই-ভাইপোদের দুর্গতি।—আউরঙ্গজিব সম্রাট হইযা দারা, সুজা প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দারা প্রাণের ভয়ে পলাইয়া পলাইযা বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক রাজা তাঁহাকে ধরিযা আউরঙ্গজিবের নিকট পাঠাইযা দিল। কয়েক দিন পরে তাঁহাকে কাটিবার হুকুম হইল। তিনি আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি হত্যাকারী আসিযা তাঁহাকে, কাটিয়া ফেলিল। সুজা

আপনার পরিবারাদি সঙ্গে লইয়া আরাকান রাজ্যে গেলেন। সেখানকার রাজা তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে কাটিয়া ফেলিল। মোরাদ তো কয়েদেই ছিলেন, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া থাকেন ইহা আউরঙ্গ-জিবের ইচ্ছা নহে, এই জন্য একটা ছলনা করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহাকে গোখুরা সাপ দিয়া খাওয়ান হইয়াছিল। দারার দুই ছেলে সোলেমান ও সেপেহরকে কয়েদ করা হইল। অনেকে অনুমান করেন, শীঘ্রই তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারা হইয়াছিল।

শাহজেহানের অবস্থা।—এইরূপে বুড়া বাপকে কয়েদ করিয়া, ভাই ভাইপোদের নিপাত করিয়া আউ-রঙ্গজীব নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ শাহ-জেহান এই ঘটনার পর যত দিন জীবিত ছিলেন, তাহার মধ্যে আউরঙ্গজিব তাঁহার প্রতি আর কোন অত্যাচার করেন নাই, বরং তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও সম্মানের সহিত রাখিয়াছিলেন। এত বড় অন্যায় কার্য্য করিয়া তিনি অবশ্যই মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি আর পিতার সহিত কখন দেখা করিতে পারেন নাই। সাক্ষাৎ না হউক, পুত্রের উপর পিতার রাগ ক্রমে অনেক কমিয়া গিয়াছিল।

বর্গিদের কথা।—“ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল

বর্গি এলো দেশে; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?" ছেলে ঘুম পাড়াইবার সময় মা ছেলের কাণ চাপড়াইতে চাপড়াইতে এই শ্লোক বলিয়া থাকেন। বর্গি কি তাহা তোমরা জান না বোধ হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে মহারাষ্ট্র বা মাহারাট্টা নামে এক হিন্দু জাতি আছে। তাহাদের লোকে চলিত কথায় বর্গি বলে। এই বর্গিরা কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া লুটপাট করিত। তাহাদের সেই দৌরাত্ম্যের নাম বর্গির হাঙ্গামা। সেই মাহারাট্টারা আউরঙ্গজিব বাদশাহের সময়ে বড় প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা।—মাহারাট্টাদের মধ্যে যদু রায় নামে এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বাদশাহদিগের অধীনে যিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন, যদু রায় তাঁহারই অধীনে এক সেনাপতির কর্ম্ম করিতেন এই যদু রায়ের অনুগ্রহে মালোজি নামে আর একজন মাহারাট্টা একটী ছোট খাট সেনাপতি হইয়া উঠিলেন। একদিন যদু রায়ের বাটীতে একটা সমারোহের কাজ ছিল। সেখানে মালোজি, সাহজি নামে আপনার পাঁচ বছরের ছেলেকে লইয়া, উপস্থিত ছিলেন। বালক সাহজি ও যদু রায়ের তিন বছরের একটী কন্যা মিলিয়া খেলা করিতেছিল। যদু রায় তাহাদের দুইজনকে আপনার দুই

হাঁটুর উপর লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেশ ছেলে মেয়ে দুটী, ইহারা বর কনে হইলে বেশ হয়।" এই কথা যেই তিনি আমোদ করিয়া বলিলেন, অমনই মালোজি সকলকে সাক্ষী করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ সকলে, আমার ছেলের সহিত যদু রায়ের মেয়ের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। যদু রায় মাহারাট্টাদের মধ্যে কুলে শীলে খুব বড় লোক, মালোজির পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। তিনি কাজেই মালো-জির এই কথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ত্যাগ করিলেন; কিন্তু মালোজির তখন পড়তা পড়িয়া গিয়াছে, ক্রমেই তাঁহার ভাল হইতে লাগিল এবং কিছুকালের মধ্যেই তাঁহার ধন মান বেশ বাড়িয়া উঠিল। তখন মালোজির পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যদু রায় আর অপমানজনক বলিয়া মনে করিলেন না। পরে ধূমধামের সহিত এই বালক বালি-কার বিবাহ হইয়া গেল। সাহজির এক ছেলের নাম শিবজি। এই শিবজি মহারাষ্ট্র জাতির সকল উন্নতির মূল।

শিবজির বাল্যকাল।—পুনা নামক স্থানে সাহজির কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল। সাহজি, দাদাজি নামক এক মাহারাট্টা ব্রাহ্মণের হস্তে শিশু শিবজিকে মানুষ করিবার ভার দিয়া, পুনায় রাখিয়া দিলেন এবং আপনি আপনার কাজ কর্ম্ম লইয়া নানাস্থানে ব্যস্ত থাকিলেন। মাহা-

মারাট্টারা লেখা পড়ার বড় ধার ধারে না। তাহাদের মধ্যে লেখা পড়ার কাজ কেবল ব্রাহ্মণেই করিয়া থাকে। সুতরাং শিবজি লেখাপড়ার দিক দিয়াও গেলেন না। ঘোড়ায় চড়া, শীকার করা, লড়াই করা প্রভৃতি কাজে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং তিনি তাহাতেই পাকিয়া উঠিলেন। তাঁহার অনেক সঙ্গীও জুটীয়া গেল, "হাত চেয়ে আম বড" হইয়া পড়িল। ষোল বৎসর বয়সের সময়েই শিবজি বড় বাড়াইয়া তুলিলেন এবং সুবিধা পাইলে এদিকে ওদিকে এক আধটা ডাকাতিও করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজ্যলাভের আরম্ভ।—ক্রমেই শিবজির সাহস ও ভরসা বাড়িতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, "মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার।" তখন ছোট খাট লুঠপাঠ ছাড়িয়া দিয়া শিবজি বিজাপুরের রাজার দুই একটা দুর্গ মারিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। বিজাপুর রাজ্য পুনা হইতে অধিক দূর নহে; সেখানকার রাজা বাদশাহের অধীন। এক এক করিয়া শিবজি অনেক দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। প্রথম প্রথম বিজাপুরের রাজা ইহাতে বড লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু ক্রমে শিবজির যখন বড় বাড়াবাড়ি হইল তখন তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি মনে করিলেন, সাহজির পরামর্শেই শিবজি এই সকল কাণ্ড করিতেছেন। এই মনে করিয়া তিনি কৌশলে সাহজিকে ধরিয়া বন্দী করিলেন। সাহজি কোন দোষের দোষী

নহেন; কিন্তু সে কথা শুনে কে? সাহজি বিনা দোষে অন্ধকার কয়েদে পচিতে লাগিলেন। মহাবিভ্রাট দেখিয়া শিবজির মনে বড় ভয় হইল। তখন তিনি কৌশলে বাদশাহকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার অধীনে এক সেনাপতির কর্ম্ম পাইলেন। শিবজির পিতাকে কয়েদ করিয়া রাখা তখন আর সোজা কথা নয়। কারণ বিজাপুরের রাজা যে বাদশাহের অধীন, শিবজি সেই বাদশাহের একজন প্রধান সেনাপতি। অতএব শিবজি চটিলে হয়ত বাদশাহও চটিতে পারেন। এই সকল ভাবিয়া বিজাপুরেব রাজা সাহজিকে ছাড়িয়া দিলেন।

বিজাপুর রাজার যুদ্ধ।—যেই শিবজি দেখিলেন পিতা খালাস হইয়াছেন, সেই তিনি পূর্ব্বের মত রাজ্য দখল করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া বিজাপুরের রাজা আফজাল খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে শিবজির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শিবজি আবার মানুষ, তাহাকে জয় করিতে কতক্ষণ লাগে, এইরূপ ভাবে আফজাল খাঁ অনেক আস্ফালন করিলেন। শিবজি এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন কতই ভয় পাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের সহিত অধীনতাও স্বীকার করিয়া লোক পাঠাইলেন। তাহার পর শিবজি আফজাল খাঁর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কে

জানিত যে তিনি পোষাকের মধ্যে ছোরা লুকাইয়া রাখিয়াছেন? দেখা হইলে শিবজি সহজেই আফজালকে মারিয়া ফেলিলেন। এই রূপে শত্রু নিপাত করিয়া শিবজি আরও দৌরাত্ম্য বাড়াইয়া তুলিলেন। তখন বিজাপুরের রাজা অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া নিজে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। যুদ্ধে বড় কিছু হইল না, তবে একটা সন্ধি হইয়া আপাততঃ কতক মিটমাট হইয়া গেল।

বাদশাহের সহিত বিরোধ।—এদিকে কতকটা ঠাণ্ডা হইল বটে, কিন্তু শিবজি তো ঠাণ্ডা হইবার লোক নহেন। এখন তিনি বিজাপুরের রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বাদশাহের খাস রাজ্যে হাত বাড়াইতে লাগিলেন এবং দুই একটা রাজ্য দখল করিলেন। তখন শায়েস্তা খাঁ নামে একজন সেনাপতি শিবজির বিরুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে পুনা নগরে আসিয়া আড্ডা করিয়া বসিলেন। শিবজি সে সময় পুনা হইতে ছয় ক্রোশ দূরে একটা দুর্গের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। পুনার মধ্যে শিবজি যাহাতে কোন মতেই ঢুকিতে না পারেন, শায়েস্তা খাঁ প্রথমেই তাহার ব্যবস্থা করিলেন। শিবজি কিন্তু ধূর্ত্তের ধূর্ত্ত। একদিন সন্ধ্যার সময়ে পুনা নগরের মধ্যে একটা বিবাহের বর ও লোকজন যাইতেছিল। শিবজি কৌশল করিয়া সেই বিবাহের দলে মিশিয়া পুনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। পুনার যে বাটীতে শিবজি আজন্মকাল

বাস করিতেন তাহাতেই শায়স্তা খাঁর বাসা। শিবজি খিড়কি দিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কেহ জানিতে পারিবার আগেই শায়স্তা খাঁর শুইবার ঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি কষ্টে জানালা ভাঙ্গিয়া, নীচে লাফাইয়া পড়িয়া, শায়স্তা প্রাণ বাঁচাইলেন। কেবল তাঁহার হাতের দুটী আঙ্গুল কাটা গেল। কিন্তু তাঁহার ছেলে ও সঙ্গের অনেক লোককে শিবজি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন।

শিবজির রাজত্ব।—সাহজির মৃত্যু হইল। শিবজি তখন স্বাধীন ভাবে রাজা হইয়া বসিলেন (১৬৬৫) এবং নিজের নামে টাকা ছাপাইয়া চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে বাদশাহ আরও বিরক্ত হইলেন এবং দিলার খাঁ ও রাজা জয়সিংহ নামে দুইজন বড় বীরকে শিবজির বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা আসিয়া শিবজিকে বড় কাবু করিয়া ফেলিলেন। তখন শিবজি আর কোন উপায় না দেখিয়া বাদশাহের সহিত ভাব করিলেন। বাদশাহ আউরঙ্গজিবও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার উন্নতির আশ্বাস দিয়া দুইখানি পত্র লিখিলেন এবং একবার দিল্লী আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া শিবজি আপনার পুত্র শম্ভুজিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

শিবজির কয়েদ।—আউরঙ্গজিব বাদশাহ কত ধূর্ত্ত

লোক, তাহা তোমরা জানই তো। শিবজি দিল্লীতে পৌঁছিলে বাদশাহ মনে করিলেন, এবার বড় মাছ জালে পড়িয়াছে, আর ছাড়া হইবে না। তিনি শিবজিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। শিবজি মহা গোলে পড়িয়া গেলেন। ধূর্ত্ত বাদশাহের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইয়া যাওয়া সহজ কথা কি? কিন্তু শিবজি যেখানে ছুঁই না চলে সেখানে বেটে চালাইতে পারেন। তিনি প্রতিদিন নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বড় বড় ঝুড়ি করিয়া বাহিরে সন্ন্যাসী, ফকির ও দুঃখীদের দিবার জন্য পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই বাটীতে বড় বড় ঝুড়ি যাওয়া আসা করিত দেখিয়া পাহারাওয়ালাদের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। তাহার পর একদিন শিবজি ও তাঁহার ছেলে সন্দেশের সঙ্গে সন্দেশ হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া আসিলেন। তিনি এক ঝুড়িতে বসিলেন এবং তাঁহার ছেলে আর এক ঝুড়িতে বসিলেন। তাঁহাদের উপর সন্দেশ মিষ্টান্ন চাপা দেওয়া হইল। মুটেরা সন্দেশের ঝুড়ি ভাবিয়া পাহারা-ওয়ালাদের সম্মুখ দিয়াই তাঁহাদের মাথায় করিয়া বাহিরে আসিল। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া এক ঘোড়ার উপর চড়িয়া বাপ বেটা পলাইয়া গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে নয় মাস পরে আপনার রাজধানী রায়গড় নগরে ফিরিয়া আসিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে আর একবার ধরিবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শিবজির কথা শেষ।—শিবজি তো পূর্ব্বেই রাজা হইয়াছিলেন, এখন আবার আরও জাঁকাইয়া রায়গড়ে বসিয়া মাথায় রাজার মুকুট পরিলেন এবং নূতন নূতন রাজ্য দখল করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষে যতই করুক, মৃত্যুকে কেহ কখন আটকাইতে পারে না। কঠিন পীড়া হইয়া শিবজির মৃত্যু হইল (১৬৮০)। তখন তাঁহার বয়স তিপ্পান্ন বৎসর।

শম্ভুজি।—শিবজির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শম্ভুজি রাজা হইলেন। তাঁহার এক বিমাতা রাজারাম নামে আপনার ছেলেকে রাজা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অপরাধে শম্ভুজি সেই বিধবা বিমাতাকে বড় কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলিলেন, রাজারামকে শিকল পরাইয়া কয়েদ করিলেন এবং অনেক লোকের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। শিবজি যেমন ক্ষমতাবান লোক ছিলেন শম্ভুজি তেমন ছিলেন না। তিনি অনেক যুদ্ধ ও লুটপাঠ করিলেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। আউরঙ্গজিব নিজে দক্ষিণ দেশে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। সেই সময়ে শম্ভুজি মুসলমানদের হাতে ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে আউরঙ্গজিবের সম্মুখে ধরিয়া লইয়া আসিলে বাদশাহ তাঁহাকে মুসলমান হইতে বলিলেন। শম্ভুজি সে কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাদশাহকে খুব গালি দিলেন এবং মুসলমান ধর্ম্মের আদি দেবতা মহম্মদের অনেক কুৎসা করিলেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ শম্ভু-

জিকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। বাদশাহের লোকেরা অতি নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহার প্রাণ নাশ করিল। প্রথমে লোহার শিক পোড়াইয়া তাঁহার চক্ষুর মধ্যে দিয়া চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল; তাহার পর তাঁহার জিহ্বা কাটিয়া দিল এবং শেষে তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিল (১৬৮৯)।

রাজারাম ও সাহো।—তাহার পর শম্ভুজির শিশু পুত্র সাহো রাজা হইলেন এবং সেই শিশুর খুড়া রাজারাম অভিভাবক হইলেন। এই রাজারামকে শম্ভুজি কয়েদ করিয়াছিলেন। নূতন লোক রাজা হওয়ার পর আউরঙ্গজিব রায়গড় ঘেরাও করিলেন। তখন রামরাজা জিঞ্জি নামক স্থানের দুর্গে পলায়ন করিয়া রাজা নাম ধারণ করিলেন। এদিকে শিশু সাহো মোগলদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। রাজারামের মৃত্যু হইলে (১৭০০) তাঁহার শিবজি (২য়) নামক ছেলে রাজা হইলেন। সাহো অনেক দিন মোগলদিগের হাতেই ছিলেন। আউরঙ্গজিব বাদশাহের মৃত্যু হওয়ার কিছু দিন পরে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

আউরঙ্গজিবের মৃত্যু।—আউরঙ্গজিবের আর যতই গুণ থাকুক একটী বড় দোষ ছিল, তিনি হিন্দুদের দুচক্ষের বিষ দেখিতেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রতি মানুষের উপর জিজিয়া নামে এক প্রকার কর ধার্য্য করিয়াছিলেন, আর তাঁহাদের অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়াছিলেন এবং

আরও নানা প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুগণ আউরঙ্গজিবের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ক্রমে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাজপুতেরা অনবরত যুদ্ধ করিতে লাগিল, মাহারাট্টাদের লুটপাটের তো কথাই নাই। এই সকল কারণে খরচ বেশি ও আয় কম হওয়ায় অর্থের অনাটন হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ বয়সে এই সকল বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বাদশাহকে বড়ই পরিশ্রম করিতে হইতেছিল; তজ্জন্য তাঁহার শরীর বড়ই কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে (১৭০৭) পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করার পর, উননব্বই বৎসর বয়সে, বাদশাহ আউরঙ্গজিব প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সময়ে মোগল রাজ্য যেমন ভাল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনই মন্দ হইয়া গেল।

শেষ মোগল সম্রাটগণ।

বাহাদুর শাহ।—আউরঙ্গজিবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মোয়াজিম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন (১৭০৭)। তিনি মাহারাট্টাদের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিয়া আপাততঃ তাহাদের থামাইয়া রাখিলেন এবং রাজপুতদিগের সহিত একটা সন্ধি করিলেন। শিখদিগের সহিত এই বাদশাহের এক যুদ্ধ হয়। শিখেরা

কে, আগে বলিয়া তাহার পর যুদ্ধের কথা বলিব। নানক নামে এক ধার্ম্মিকলোক বহুদিন হইল হিন্দুধর্ম্মের একটা মত লইয়া শিখধর্ম্ম নামে এক ধর্ম্ম স্থাপন করেন। অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। এই শিখেরা বড় শান্ত ছিল এবং কাহারও সহিত শত্রুতা না করাই তাহাদের মত ছিল। মুসলমানেরা ক্রমে শিখদের শত্রু হইয়া উঠিল এবং আকবর বাদশাহের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, তখন যিনি শিখ গুরু ছিলেন, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। ইহাতে শিখেরা বড়ই দুঃখিত হইল এবং যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদের পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আউরঙ্গজিবের সময়ে শিখদের যিনি গুরু ছিলেন তাঁহার নাম গুরুগোবিন্দ। তিনি যত্ন করিয়া সকল শিখকেই যোদ্ধা করিয়া তুলিলেন। গুরুগোবিন্দও মুসলমানদের হাতে মারা পড়িলে, বন্দু নামে আর একজন গুরু হইলেন এবং মুসলমানদের মসজিদ ভাঙ্গিতে, মোল্লাদের কাটিতে এবং নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাদের ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সকলকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং বাদশাহ বাহাদুর শাহ যাইয়া শিখদের হারাইয়া দিলেন। তাহারা কতক মারা পড়িল, কতক পলাইয়া গেল, বন্দু কিন্তু ধরা পড়িলেন না। এই ঘটনার পরেই বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইল (১৭১২)।

জেহান্দর শাহ।—আর সকল ভাই ও ভাইপোদের

প্রাণনাশ করিয়া বাহাদুরের পুত্র জেহান্দর সিংহাসনে বসি- লেন। কেবল ফেরোকসির নামে তাঁহার এক ভাইপো বাঁচিয়া ছিলেন। বেহারের শাসনকর্ত্তা সায়দ হোসেন এবং এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সায়দ আবদুল্লা ফেরো- কসিরের সহায় হইলেন। ফেরোকসির যুদ্ধ বাধাইলে জেহান্দর হারিয়া গিয়া একজন বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লই- লেন। সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধু জেহান্দরকে ফেরোকসিরের হাতে ধরিয়া দিল। বলা বাহুল্য ফেরোকসির জেহান্দরকে নিপাত করিলেন (১৭১৩)।

ফেরোকসির।—ফেরোকসির বাদশাহ হইলে হোসেন ও আবদুল্লা সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। শিখগণ এতদিন চুপ করিয়া ছিল; এক্ষণে আবার বন্ধু দলবল লইয়া বাহির হইলেন। তখন বাদশাহ বন্ধুকে দমন করি- বার জন্য একজন দক্ষ সেনাপতি পাঠাইলেন। শিখদের ধরিয়া দিল্লীতে আনা হইল। দিল্লী আসার পর সাতদিন ধরিয়া শিখদের কাটিয়া ফেলা হইল। তাহার পর বাদ- শাহের লোকেরা বন্ধু ও তাঁহার একটী শিশু সন্তানকে লোহার খাঁচায় পুরিয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় দেখাইয়া বেড়াইল। তাহারা বন্ধুর হাতে এক তরবারি দিয়া তাঁহাকে আপনার ছেলে কাটিতে জেদ করিল। মানুষ কি তাহা পারে? বন্ধু তাহা করিলেন না দেখিয়া তাহারা সেই শিশুকে বন্ধুর সম্মুখেই কাটিল এবং

তাহার বুকের ভিতর হইতে রক্তস্থলী বাহির করিয়া বন্ধুর মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর ঠিক আগুনের মত গরম লোহার চিমটা দিয়া তাঁহার গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া দিতে লাগিল। বন্ধু স্বধর্ম্মে থাকিয়া, তেজের সহিত, অকাতরে প্রাণ হারাইলেন। নানা কারণে ফেরোকসিয়রের সহিত সায়দ হোসেনের বনিবনাও হইল না। তখন তিনি ও সায়দ আবদুল্লা মিলিয়া ফেরোকসিয়রের প্রাণনাশ করিলেন (১৭১৯)। তাহার পর তাঁহারা একে একে আর দুই জনকে সম্রাট করিলেন। কিন্তু সে দুই জনই শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া গেলেন। তখন মহম্মদ নামে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহারা সিংহাসনে বসাইলেন (১৭১৯)।

মহম্মদ শাহ।—কিসে সায়দ হোসেন ও সায়দ আবদুল্লার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ইহাই মহম্মদের চিন্তা হইল। মীর হাইদর নামে এক দুরন্ত লোক কৌশলে সায়দদের নিপাত করিবার ভার লইল। এক দিন হোসেন পাল্কী চড়িয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে হাইদর এক দরখাস্ত লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল। হোসেন তাহার হাত হইতে দরখাস্ত লইয়া যেমন পড়িতে আরম্ভ করিবেন, অমনই হাইদর তাঁহার বুকে ছোরা মারিল। তৎক্ষণাৎ হোসেনের মৃত্যু হইল। সঙ্গে সঙ্গে হোসেনের লোকেরা হাইদরকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিল। তাহার পর আবদুল্লা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া

বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন; কিন্তু হারিয়া বন্দী হইয়া রহিলেন। মাহারাট্টাদের কথা অনেকক্ষণ বলা হয় নাই। বোধ হয় তাহাদের মধ্যে এখন কি হইতেছে জানিতে তোমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। এখন সাহো তাহাদের রাজা। প্রধান মন্ত্রীকে মাহারাট্টারা 'পেশবা বলে। এই সময়ে যিনি সাহো রাজার পেশবা ছিলেন তাঁহার নাম বাজিরাও। ইঁহার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস ও বীরত্ব ছিল। ইনি ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই মহারাষ্ট্র-প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন। এইরূপ সময়ে ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া বড় এক বিপদের ঝড় বহিয়া গেল। পারস্য দেশে নাদীরকুলি নামে এক সামান্য লোক ছিলেন। তিনি আপনার ক্ষমতায় ক্রমে ক্রমে পারস্য দেশের রাজা হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিলেন। বাদশাহ মহম্মদ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া হারিয়া গেলেন এবং নাদীর আসিয়া দিল্লী অধিকার করিলেন। তিনি দিল্লীর যেরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন সে দুঃখের বৃত্তান্ত আর লিখিব না। তাইমুর-লঙ্গ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, নাদীর তাহার অপেক্ষা কিছুই কম করিলেন না। তাহার পর দিল্লীর রাজবাটীতে যত ধন রত্ন ছিল, এবং অন্য যেখান হইতে যে উপায়ে হউক, যে কিছু টাকা পাওয়া গেল, সে সমস্ত লইয়া নাদীরকুলি চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি

মহম্মদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া গেলেন। নাদীর-কুলি চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরে বাজিরাও পেশবার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার পুত্র বলজি পেশবা হইয়া পিতার ন্যায় যত্নে ভারতবর্ষের চারিদিকে মাহারাট্টাদের ক্ষমতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে সাহো রাজার মৃত্যু হইলে বলজি শিবজির বংশের এক শিশুকে নামমাত্র রাজা করিলেন এবং সেই অবধিই বলজি এবং তাঁহার বংশীয় পেশবাগণই মাহারাট্টাদের মধ্যে সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। এদিকে দিল্লীতে বাদশাহ মহম্মদের মৃত্যু হইল (১৭৪৮)।

আহমেদ শাহ।—মহম্মদের পুত্র আহমেদ শাহ বাদশাহ নাম অধিকার করিলেন। কিন্তু মোগলদের দশা নাকি এখন বড় মন্দ, এজন্য চারিদিকে সকলেই তাঁহাদের উপর চক্ষু রাঙ্গাইতে লাগিল। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সাদৎ খাঁর পুত্র সাফদর জঙ্গ এই বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আহমেদের বড় মনান্তর ঘটিল। হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তা আসফ-জার পৌত্র ঘাজিউদ্দীন এই সুযোগে বাদশাহের প্রিয়-পাত্র হইল এবং কৌশল করিয়া সাফ্‌দরজঙ্গকে সরাইয়া দিল। সাফ্‌দরজঙ্গ অযোধ্যা ও এলাহাবাদ রাজ্য লইয়া স্বাধীন হইয়া বসিলেন। এদিকে ঘাজিউদ্দীনের ব্যব-হারে বাদশাহ বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তখন দুষ্ট

ঘাজিউদ্দিন বাদশাহ ও তাঁহাব জননীকে অন্ধ করিয়া বন্দী করিল (১৭৫৪)। তাহার পর ঘাজিউদ্দীন সম্রাট বংশের আব এক জনকে আলমগীর নাম দিয়া বাদশাহ করিল।

আলমগীর।—ঘাজিউদ্দীন আলমগীবের প্রাধান মন্ত্রী হইল। আহমেদ শাহ দুরানি নামে একজন আফগান রাজা ইহাব পূর্ব্বে দুইবার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অনেক অত্যাচাব করিয়া পঞ্জাব রাজ্য অধিকাব করিযাছিলেন। পঞ্জাবে তিনি যে শাসনকর্ত্তা রাখিযা গিযাছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্র, আপন মাতাব অধীনে থাকিয়া, পিতার পদ পাই-লেন। দুষ্ট ঘাজিউদ্দীন সেই শিশুর মাতাকে বন্দিনী কবিয়া দিল্লীতে আনিল। আহমেদ শাহ দুবানি এই সংবাদ পাইয়া যার-পর-নাই বিরক্ত হইলেন এবং তৃতীয়বার ভারতে আসিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। নাদীরকুলি দিল্লীর যেরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন এবার আহমেদ দুরানিও তাহাই করিলেন। কেবল দিল্লীর উপর অত্যাচার করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। আরও কোন কোন স্থানে তিনি মানুষ মারিয়া রক্তের নদী বহাইয়া দিলেন। বিশেষতঃ একটা পর্ব্বের দিনে হিন্দুর প্রধান তীর্থ মথুরা নগরে উপ-স্থিত হইয়া সেখানকার প্রায় সমস্ত লোককে নিরপরাধে কাটিয়া ফেলিলেন। তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় দুর্ব্বল আলমগীর দুষ্ট ঘাজিউদ্দীনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহগণ এখন এমনই ক্ষমতাহীন হইয়াছিলেন যে, পরের সাহায্য না পাইলে তাঁহাদের আপনার মন্ত্রীকে তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতাও ছিল না। আহমেদ শাহ দুরানি আলমগীরের জন্য আর এক জন মন্ত্রী ঠিক করিয়া দিয়া নিজদেশে চলিয়া গেলেন। ইহাতে মন্ত্রী ঘাজিউদ্দীন বড়ই চটিযা উঠিল এবং বাদশাহকে জব্দ করিবার জন্য মাহারাট্টাদের ডাকিযা আনিল। তখন বলজি পেশবার ভাই রাঘব আসিযা প্রথমে দিল্লী, পরে পঞ্জাব অধিকার করিলেন। আহমেদ শাহ দুরানি পঞ্জাব হাতছাড়া হইল দেখিযা চতুর্থবার ভারতবর্ষে আসিলেন। এদিকে ঘাজিউদ্দীন আলমগীর বাদশাহকে মারিযা ফেলিল। এত দিনের পর এই স্থানেই অতি পরাক্রান্ত মোগল রাজত্বের শেষ হইল। আউরঙ্গজিব বাদশাহের সময় হইতেই মোগল রাজত্বে ঘুণ ধরিযাছিল, এখন তাহা ভাঙ্গিযা গেল। বলিতে গেলে এখন মাহারাট্টারাই ভারতবর্ষের রাজা হইযা উঠিলেন। প্রায সমস্ত ভারতই তাঁহাদের অধীন হইল। যে যে স্থান তাঁহারা আপনারা শাসন করিতেন না, সে সে স্থান হইতেও তাহারা 'চৌথ,' অর্থাৎ সেখানকার আয়ের চারি ভাগের এক ভাগ আদায় করিতেন। মাহারাট্টারা পঞ্জাব রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া আহমেদ শাহ দুরানি মহারাষ্ট্রীয়গণের

সহিত পাণিপথ নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা অনেক সৈন্য ও কামান আনিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহাদের ভয়ানক পরাজয় হইল ও অনেক লোক মারা গেল এবং বিস্তর অর্থ নষ্ট হইয়া গেল। এই যুদ্ধের পর মাহারাট্টারা আর অনেক দিন মাথা তুলিতে পারিলেন না। এদিকে ভারতবর্ষে বহু দূর দেশ হইতে এক নূতন জাতি আসিয়া ধীরে ধীরে রাজ্য পাতিতে আরম্ভ করিতেছিলেন। মোগল রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে সেই জাতিই এদেশে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে তাঁহাদেরই বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইংরাজ কোম্পানি।

ইউরোপীয়গণের আগমন।—ইউরোপ মহাদেশের অনেকগুলি দেশের লোক, মোগল রাজত্বের প্রথম সময়ে, আমাদের দেশে আসিয়া, এখানকার যে যে সামগ্রী তাহাদের দেশে বিক্রয় হইতে পারিবে তাহা লইয়া

যাইত এবং তাহাদের দেশের যে যে জিনিষ এখানে আনিলে বিক্রয় হইতে পারিবে তাহা লইয়া আসিত। পোর্টুগাল দেশের পোর্ত্তুগীজ, হলণ্ড দেশের ওলন্দাজ, ডেন্মার্ক দেশের দিনেমার, ইংলণ্ড দ্বীপের ইংরাজ, এবং ফ্রান্স দেশের ফরাসী জাতিরা আমাদের দেশে ঐরূপে বাণিজ্য করিত।

ইংরাজ কোম্পানি।—যে সময়ে আকবর এদেশের বাদশাহ, সেই সময়ে ইংলণ্ড রাজ্য এলিজাবেথ নামে এক জন মেয়ে মানুষের হাতে ছিল। "ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" নাম গ্রহণ করিয়া একদল ইংরাজ সেই সময়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন। তাঁহারা এদেশের অনেক স্থানে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কুঠি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বম্বে এই তিন স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে কলিকাতার এখন এত শোভা সে কলিকাতা সে সময়ে অতি সামান্য স্থান ছিল।

ইংরাজ ও ফরাসীর বিবাদ।—দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট ও হায়দরাবাদ নামে দুইটী প্রদেশ আছে। কর্ণাটের নবাব ও হায়দরাবাদের নিজাম মরিয়া গেলে কে নবাব এবং কে নিজাম হইবে ইহা লইয়া ভারী বিবাদ বাধিয়া গেল। বাদশাহেরাই এ সকল বিষয় স্থির করিয়া দিবার কর্ত্তা। কিন্তু তাঁহাদের তখন যে দুর্দ্দশা তাহাতে

কেবা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করে, কেই বা তাঁহাদের কথা মানে। এই গোলে ইংরাজেরা এক পক্ষ এবং ফরাসীরা আর এক পক্ষ গ্রহণ করিলেন। বাণিজ্য করিতে আসিয়া তাঁহারা রাজা নবাব করিতে বসিলেন। দুই দলে অনেক দিন ধরিয়া খুব যুদ্ধ হইল। শেষে কর্ণাটে ইংরাজেরাই এক প্রকার রাজা হইয়া উঠিলেন।

বাঙ্গলা জয়।—এই সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে সেরাজউদ্দৌলা নামে এক নবাব ছিলেন। মুরশিদাবাদে নবাবদের রাজধানী ছিল। সেরাজউদ্দৌলার নাম তোমরা আগে শুন নাই কি? লোকে এখনও যখন তখন এই সেরাজউদ্দৌলার নাম করিয়া থাকে। কলিকাতার ইংরাজেরা কয়েকটী কার্য্য দ্বারা নবাব সেরাজউদ্দৌলাকে বড় রাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সেরাজ সেই রাগে আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন এবং ইংরাজদের কলিকাতার কুঠি দখল করিলেন। ইংরাজদের অনেকেই নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিল; কেবল এক শত ছচল্লিশ জন ইংরাজ নবাবের হাতে ধরা পড়িল।

অন্ধকূপ হত্যা।—রাত্রে সেই একশ ছচল্লিশ জন ইংরাজকে নবাবের লোকেরা একটী ছোট ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। দারুণ গ্রীষ্মে ও তৃষ্ণায় ইংরাজদের যার-পর-নাই কষ্ট হইতে লাগিল এবং তাহারা বিষম আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। নবাবের হুকুম না পাইলে

তাঁহাদের সে ঘর হইতে বাহির করে কে? নবাব ঘুমাইয়া আছেন, তাঁহাকে তখন এ সকল কথা জানাইবেই বা কে? কাজেই সে রাত্রি ইংরাজদিগকে সেই ঘরেই থাকিতে হইল। দারুণ কষ্টে এক শত ছচল্লিশ জনের মধ্যে এক শত তেইশ জন মরিয়া গেল! প্রাতে নবাবের লোকেরা ঘরের দরজা খুলিয়া দেখিল, কেবল তেইশ জন মাত্র বাঁচিয়া আছে। এই ঘটনার নাম অন্ধকূপ হত্যা।

কলিকাতা লাভ ও যুদ্ধের চেষ্টা।—এই সময়ে মান্দ্রাজে রবার্ট ক্লাইব নামে এক বড় বীর ছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিবামাত্র ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন নামে আর এক জন যোদ্ধা কিছু সৈন্য সঙ্গে আসিয়া সহজেই কলিকাতা অধিকার করিলেন এবং নবাব সেরাজউদ্দৌলাকে তাড়াইয়া আর এক জন নূতন নবাব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফর ও আরও কোন কোন লোক ভিতরে ভিতরে ইংরাজদের সহিত এই জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ওমিচাঁদ নামে এক ধনবান লোক এই চক্রান্তের মধ্যে ছিল। সে বলিল, কলিকাতা আক্রমণে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে; সেই ক্ষতি যদি এখন ইংরাজেরা পুরাইয়া না দেন তাহা হইলে সে সমস্ত পরামর্শ নবাবকে জানাইয়া দিবে। ক্লাইব দেখিলেন এ তো বড় গোলের কথা।

তখন তিনি টাকা দিবার এক মিথ্যা কড়ার করিয়া অমি-চাঁদকে এক দলিল লিখিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ধার্ম্মিক ওয়াট্‌সন্ এরূপ মিথ্যা দলিলে নাম সহি করিতে চাহিলেন না। ক্লাইব তখন অক্লেশে তাহাতে নিজে ওয়াট্‌সনের নাম সহি করিলেন। জাল ও প্রবঞ্চনা দুইই করা হইল।



লর্ড ক্লাইব।

পলাশীর যুদ্ধ।—ভিতরকার বন্দোবস্ত সব পাকা হইয়া গেলে ক্লাইব নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। পলাশী নামক স্থানের মাঠে নবাবের সহিত ইংরাজদের লড়াই হইল (১৭৫৭)। নবাব ইংরাজদের অপেক্ষা অনেক বেশি সৈন্যাদি লইয়া আসিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে তাঁহারই জয় হয় হয় হইয়াছিল। কিন্তু অবিশ্বাসী মীরজাফর আগেই ইংরাজদের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে নবাবকে পাঁচ রকম বুঝাইয়া লড়াই বন্ধ করিয়া দিলেন। আর যাবি কোথা—যুদ্ধ যেই বন্ধ হওয়া অমনই ক্লাইব জুত পাইলেন। নবাবের সৈন্যেরা হাত বন্ধ করিল, কিন্তু ইংরাজেরা তাহা করিল না। শুধু দাঁড়াইয়া মার খাওয়া তো যায় না, কাজেই নবাবের সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাব পলাইয়া গেলেন এবং কয়েক দিন পরে ধরা পড়িয়া মীরজাফরের হাতে পড়িলেন। মীরজাফরের ছেলে মীরণ তাঁহাকে বড় নিষ্ঠুরতার সহিত মারিয়া ফেলিল। এদিকে গোল শেষ হইলে, ওমিচাঁদ কড়ার মত টাকা পাইবার নিমিত্ত ক্লাইবের নিকট হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। ক্লাইব সমস্ত কথা হাসিয়া উড়াইলেন এবং দলিল যে জাল তাহা বুঝাইয়া দিলেন। শুনা যায়, এই কষ্টে ওমিচাঁদ পাগল হইয়া গিয়াছিল।

মীরজাফর ও মীরকাসিম।—মীরজাফর এইরূপে

ইংরাজদের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্লাইব প্রথমে তাঁহাকেই নবাব করিলেন। কিন্তু তিনি ইংরাজদিগকে যত টাকা দিবেন কথা ছিল তাহা দিতে না পারায় ইংরাজেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার জামাই মীর-কাসিমকে নবাবী দিলেন। দিল্লীর বাদশাহেরা নবাবী দেওয়া বা লওয়ার কর্ত্তা। এখন আর বাদশাহ ছিলেন না; তবে আলমগীরের ছেলে শাহ আলম নামে মাত্র বাদশাহ হইয়াছিলেন। মীরকাসিম মনে করিলেন, হাজার হউক শাহ আলম বাদশাহের ছেলে; তাঁহারই অনুমতি লইয়া নবাবী করা ভাল। তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া তাঁহার আজ্ঞামতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হই-লেন। কিন্তু ইংরাজদের সহিত মীরকাসিমের বনিবনাও হইল না। তখন তাঁহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার বৃদ্ধ মীরজাফরকে নবাব করিলেন। এদিকে মীরকাসিম কতক-গুলি ইংরাজকে ধরিয়া বন্দী করিলেন এবং শেষে তাহাদের কাটিয়া ফেলিলেন। ইংরাজেরা তাঁহার সহিত খুব যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন এবং বার বার হারিয়া তিনি শেষে পলা-য়ন করিলেন। এই সকল ঘটনার কিছুদিন পরে ক্লাইব শাহ আলম বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতি বৎসরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিব স্বীকার করিলে, শাহ আলম ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশ সমর্পণ করিলেন (১৭৬৫)। ইংরাজেরা

তখনই স্যাক্লিগোপাল নবাবকে খরচের জন্য অনেক টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া সরাইয়া দিলেন এবং আপনারা বাণিজ্য করিতে আসিয়া শেষে এ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

গবর্ণর জেনেরল।—কোম্পানির হাতে প্রথমে রাজ্য ছিল বলিয়া এখনও ইহাকে লোকে 'কোম্পানির মুলুক' বলে। এ দেশে কোম্পানির যত মুলুক ছিল তাহার রাজধানী হইল কলিকাতা। এই সকল মুলুকের যিনি শাসনকর্ত্তা তাঁহার নাম হইল গবর্ণর জেনেরল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গলা মুলুকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই বন্দোবস্তের পর তিনি সমস্ত কোম্পানির মুলুকের প্রথম গবর্ণর জনেরল নিযুক্ত হইলেন (১৭৭৪)।

কোম্পানির মুলুক।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস।—হেষ্টিংস্ অনেকগুলি অন্যায় কার্য্য করিয়া নিজের এবং ইংরাজ-রাজ্যের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। শাহ আলমকে যে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিবার কথা ছিল তাহা তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন, বাড়ার ভাগ তাঁহার কোন কোন রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। অযোধ্যার মধ্যে রোহিল্লা নামে আফগান জাতীয় কতকগুলি লোক বাস করিত। অযোধ্যার নবাবের সহিত সেই রোহিল্লাদের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। হেষ্টিংস নবাবের নিকট ঘুস খাইয়া-

ছিলেন। রোহিল্লারা ইংরাজদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী ছিল না; তথাপি তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য হেষ্টিংস সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাতে সত্য সত্যই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। কোম্পানির আর একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী হেষ্টিংস্ ঘুস লইতেন বলিয়া বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নন্দকুমার নামে এক জন ব্রাহ্মণ রাজা হেষ্টিংসের ঘুস লওয়ার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তখন কোন উপায়ে নন্দকুমারকে নিপাত করিতে না পারিলে হেষ্টিংসকে বড় গোলে পড়িতে হইত। তাঁহার কপাল ক্রমে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট নামক প্রধান আদালতে নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। ইম্পে নামে হেষ্টিংসের এক পরম বন্ধু সেখানকার জজ ছিলেন। তিনি জাল করা অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়া হেষ্টিংসকে নির্ভাবনা করিয়া দিলেন। এরূপ অপরাধে ব্রাহ্মণের ফাঁসি হওয়ায় বাঙ্গালীরা অবাক্ হইল। কাশীর রাজা ইংরাজদিগকে বৎসরে বৎসরে সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা কর দিবেন স্থির হইয়াছিল। হেষ্টিংস্ তাঁহার নিকট হইতে জোর করিয়া সাড়ে সাতাইস লক্ষ টাকা আদায় করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরের পর রাজা অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা আর দিবেন না বলিলেন। তাহাতে হেষ্টিংস্ অন্যায় করিয়া রাজাকে অপমান করিলেন ও

ফাটক দিলেন। অযোধ্যার নবাব মরিয়া গেলে তাঁহার দুই বিধবা বেগমের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া হেষ্টিংস্ এক কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে পেশবাদিগের মধ্যে একটা ঘরাও বিবাদ বাধিয়া উঠে। বলজী পেশবার কথা তোমরা জান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে মধু রাও পেশবা হইয়াছিলেন। মধু রাও মরিয়া গেলে তাঁহার ভাই নারায়ণ রাও পেশবা হইলেন। এই নারায়ণ রাও মরিয়া গেলেই বিষম গোল বাধিয়া উঠিল। কতকগুলি প্রধান লোক মিলিয়া নারায়ণের কচি ছেলেকে পেশবার সিংহাসনে বসাইল, এদিকে নারায়ণের খুড়া রাঘবজী জোর করিয়া পেশবা হইয়া বসিলেন। ইংরাজদের এই গোলে মিশিবার কোন দরকার ছিল না, তবু তাঁহারা ইহাতে মাথা দিয়া অন্যায় যুদ্ধে রাঘবজীকে হারাইয়া দিলেন। দক্ষিণ দেশে হাইদর আলি নামে এক জন সামান্য লোক ক্রমে ক্রমে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং অতিশয় বলবান হইয়া সে দিকে এ সময়েও যে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য ছিল তাহা মারিয়া লইয়াছিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম ও মাহারাট্টারা মিলিয়া হাইদর আলির সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইংরাজেরা এ মজা ছাড়িতে পারেন কি? তাঁহারা বিনা কারণে হাইদরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগাইয়া দিলেন। হাইদরের মৃত্যু হইলে

তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এ দেশে এই সকল কাণ্ড কারখানা করিয়া হেষ্টিংস্ তো ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। তিনি এ দেশে যত অত্যাচার করিয়াছিলেন ইংলণ্ডে তাহার বিচার আরম্ভ হইল এবং তাঁহাকে বড়ই নাকাল হইতে হইল। সাত বৎসর ধরিয়া পার্লেমেণ্ট নামক ইংলণ্ডের মহাসভায় বিচার চলার পর হেষ্টিংস্ খালাস পাইলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্।—(১৭৮৬) এই দ্বিতীয় গবর্ণর জেনেরলও টিপু সুলতানের সহিত একবার যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার আগে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের জমি জমার বড় বেবন্দোবস্ত ছিল। কোম্পানি নিলাম ডাকিয়া জমিদারী বিক্রয় করিতেন। যে ব্যক্তি কোম্পানিকে অধিক টাকা খাজনা দিতে স্বীকার করিত সেই জমিদার হইত। তাহার পর খাজনার টাকা কুলাইতে না পারিয়া, প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিত এবং হয়ত অনেক সময়ে এত অত্যাচার করিয়াও কোম্পানির খাজনা দিয়া উঠিতে পারিত না। এই অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দশ বৎসরের জন্য একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। সেই বন্দোবস্তে ভাল ফল দাঁড়াইল দেখিয়া ক্রমে তাহাই পাকা ও চিরস্থায়ী হইল। প্রথমে দশবৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া লোকে এখনও উহাকে দশসালার বন্দোবস্ত বলে।

স্যর জন্ শোর।—(১৭৯৩) ইঁহার সময়ে লিখিবার মত বিশেষ কোন কাণ্ড ঘটে নাই।

মারকুইস্ ওয়েলেস্লি।—(১৭৯৮) ইনি গবর্ণর জেনেরল হইয়া আবার টিপুর সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন, এবং সেই যুদ্ধে টিপু মারা পড়িলেন। মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের সময় হইতে মাহারাট্টাদের মধ্যে বলজি সিন্ধিয়া ও মলহর রাও হলকার নামে দুই জন স্বাধীন রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশাবলী ইতিহাসে সিন্ধিয়া ও হলকার নামে খ্যাত। এখন যিনি মাহারাট্টাদের পেশবা ছিলেন তাঁহার নাম দ্বিতীয় বাজী রাও। কিন্তু মাহারাট্টাদের মধ্যে সিন্ধিয়া ও হলকারের এতই ক্ষমতা বাড়িয়াছিল যে পেশবা চাপা পড়িয়া গিয়াছিলেন। বাজী রাও দেখিলেন, যে সিন্ধিয়া ও হলকারকে জব্দ করিতে না পারিলে তাঁহার আর মঙ্গল নাই। কিন্তু সে তো সোজা কথা নয়। তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ইংরাজদের সাহায্য চাহিলেন। 'পাগলা, ভাত খাবি? না, হাত ধুইব কোথা?' ইংরাজেরা তো তাহাই চান। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রথমে তাঁহারা সিন্ধিয়াকে জয় করিয়া অনেক রাজ্য লাভ করিলেন। সিন্ধিয়া ও হলকারের আগে মুখ দেখাদেখি ছিল না। কিন্তু এখন উভয়েই বিপদে পড়ায় তাঁহাদের খুব ভাব হইয়া গেল। তখন ইংরেজেরা আর তাঁহাদের কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও স্যর জর্জ্জ বার্লো।—(১৮০৫) ওয়েলসলির কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসকে আবার গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিতে হইল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় স্যর জর্জ্জ বার্লো গবর্ণর জেনেরল হইয়া সিন্ধিয়া ও হলকারের সহিত সন্ধি করিলেন।

লর্ড মিণ্টো।—(১৮০৭) বার্লো চলিয়া গেলে মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হইলেন। তোমাদের মনে আছে বোধ হয়, আহমেদ শাহ দুরানি পঞ্জাব রাজ্য অধিকার করিয়া সেখানে এক জন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেই অবধি পঞ্জাব আফগানদের অধীনেই ছিল। এই সময়ে সুবিখ্যাত রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি যেমন বীর তেমনই সাহসী ছিলেন; এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'পঞ্জাব-কেশরী' অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের সিংহ বলে। তিনি নিজে শিখ ছিলেন ও শিখ সৈন্যদের সর্দ্দার ছিলেন। সময় বুঝিয়া রণজিৎ আফগানদের অধীনতা অস্বীকার করিলেন এবং পঞ্জাব প্রদেশে স্বাধীন মহারাজা হইয়া বসিলেন। লর্ড মিণ্টো রণজিতের সহিত এক সন্ধি করিয়া স্থির করিয়া দিলেন যে শতদ্রু নামক নদীর পশ্চিম দিকেই তিনি রাজত্ব করিবেন, পূর্ব্ব দিকে কখনই হাত বাড়াইবেন না।

মার্কুইস্ হেষ্টিংস্।—(১৮১৪) মিণ্টোর পর আর্ল ময়রা গবর্ণর জেনেরল হইলেন। নেপালিগণের সহিত

ময়ন্না লড়াই বাধাইলেন। তাহারা বিশেষ দক্ষতাব সহিত অনেক রণ করিল। শেষে অক্টলনি নামে এক ইংরাজ সেনাপতি তাহাদের খুঁব কাবু কবিয়া ফেলিলেন। তাহাবা সন্ধি কবিয়া অনেক জায়গা ইংবাজদিগকে ছাড়িয়া দিল। অক্টর্লনিব নাম মনে থাকিবে বলিয়া কলিকাতাব গড়েব মাঠে এক প্রকাণ্ড থাম করা হইযাছে। লোকে তাহাকে মনুমেণ্ট বলে। এই সময়ের পর আর্ল ময়বার উপাধি হইল মার্ক্ইস্ হেষ্টিংস্। দক্ষিণ দেশে পিণ্ডারী নামে এক জাতি কেবল লুঠপাঠ কবিযা খাইত ও যখন মাহাবাট্টাবা যুদ্ধ করিত তখন তাহাদের পিছনে পিছনে যাইযা দেশ লুঠ কবিত। এক্ষণে ইহাবা বড বাড়াবাড়ি কবিয়া তুলিল, কাজেই হেষ্টিংস্ তাহাদেব সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। মাহাবাট্টাবা পিণ্ডারীদিগের সহায় হইলেন। ইংবাজেবা তখন পিণ্ডাবী ও মাহাবাট্টা দুই দলকেই গলা টিপিযা ধবিলেন। সিন্ধিয়া ও হলকার দাযে পড়িয়া সন্ধি করিলেন। বাজী বাও পেশবা ইংবাজদের সঙ্গে বেশী যুদ্ধ করিযা কিছু উপর-চালাকি কবিতে গিয়াছিলেন। তিনি হারিযা গেলে ইংবাজেবা তাঁহাব রাজ্য কাড়িয়া লইলেন এবং তাঁহার খবচের জন্য বৎসবে আট লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কাণপুরেব নিকট বিথুব নামক স্থানে রাখিয়া দিলেন। পেশবাদিগের রাজ্য এই হইতে ফুরাইল। মাহাবা সহায় তাহাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া পিণ্ডারীগণ

গড়াইয়া পড়িল এবং ডাকাতি ছাড়িয়া অন্য উপায়ে জীবন চালাইতে লাগিল।

লর্ড আমহর্ষ্ট।—(১৮২৩) ব্রহ্মদেশের রাজা বাঙ্গলা দেশ আক্রমণ করায় ইংরাজ সৈন্য ব্রহ্ম দেশে লড়াই বাধাইল। ব্রহ্মের অনেক নগর ইংরাজেরা দখল করিলে সেখানকার রাজা সন্ধি করিয়া অনেক প্রদেশ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। ভরতপুরের নাবালক রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার খুড়া রাজ্য দখল করিয়াছিল শুনিয়া ইংরাজেরা দুষ্ট খুড়াকে তাড়াইয়া ভাইপোকে আবার সিংহাসনে বসাইলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।—(১৮২৮) ইনি বড় ভাল লোক ছিলেন এবং ইহাঁর যত্নে এদেশের অনেক উপকার হইয়াছে। পূর্ব্বকালে স্বামীর মৃত্যু হইলে, সেই মরা স্বামীর সহিত চিতায় উঠিয়া, তাঁহার বিধবা স্ত্রীকেও পুড়িয়া মরিতে হইত। ইহার নাম সতী-দাহ। মনে করিয়া দেখ এ কি ভয়ানক কাণ্ড! এই সময়ে রামমোহন রায় নামে একজন বড় বিদ্বান লোক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মতে বেণ্টিঙ্ক মহোদয় এই সতী-দাহ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিলেন। রামমোহন রায় রাজা উপাধি পাইয়া বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী বিলাতে যান নাই। বিলাতে রাজা রামমোহন রায়ের বড় সম্মান হইয়াছিল। ইংল-

ভেৰ মধ্যে বৃষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। উড়িষ্যা প্রদেশে খন্দ নামে এক অসভ্য জাতি আছে। তাহারা জমির ফসল বাড়াইবার জন্য মানুষ বলি দিত। বেণ্টিঙ্ক এই অন্যায় কার্য্য রহিত করিয়াছিলেন।



রাজা রামমোহন রায়।

লর্ড অকলণ্ড।—(১৮৩৬) এই গবর্ণর জেনেরলের সময়ে কাবুলে লড়াই বাধে, তাহাতে ইংরাজদের যেরূপ নাকাল হইতে হইয়াছিল তাহা আর বলিবার নহে। ইংরাজগণের প্রায় পনরো ষোল হাজার সৈন্যের মধ্যে

জন কুড়িক মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিল; আর প্রায় সকলেই মারা গিয়াছিল।

লর্ড এলেনবরা।—(১৮৪২) ইনি আসিয়াই কাবুলকে শিক্ষা দিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন এবং সেই সৈন্যেরা কাবুলের লোকদের বিলক্ষণ শাস্তি দিয়া আসিল। সিন্ধু প্রদেশের রাজারা কাবুল যুদ্ধের সময় ভাল ব্যবহার করেন নাই বলিয়া, যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের হাত হইতে সিন্ধু রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ।—(১৮৪৪) এই গবর্ণর জেনেরলের সময়ে শিখদের সহিত ইংরাজদের ভারী লড়াই হয়। শিখদের রাজা রণজিৎ সিংহ মরিয়া গেলে পর তাঁহার দুই ছেলে রাজা হন। প্রথম ছেলে শীঘ্র মরিয়া গেলেন, দ্বিতীয় ছেলেকে লোকেরা মারিয়া ফেলিল। তাহার পর দলীপসিংহ নামে রণজিতের পাঁচ বছরের এক ছেলে রাজা হইলেন। শিখদের সহিত ইংরাজদের যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে তাঁহারা কখন শতদ্রু নদীর এ পারে আসিবেন না স্থির ছিল; কিন্তু এতদিন পরে শিখদের সেনাপতি সে কথার অন্যথা করিয়া ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কাজেই তুমুল সমর বাধিয়া গেল। শিখরা খুব দক্ষতার সহিত ভারী যুদ্ধ করিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না, তাহাদের হারি হইল। তাহাদের ক্ষমতা ও রণের কৌশল দেখিয়া ইংরাজেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। গোলাবসিংহ নামে শিখদের

একজন সেনাপতি বড় গোলযোগ দেখিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাদের যুদ্ধের খরচ হিসাবে এক কোটী টাকা ধরিয়া দিলেন। তখন ইংরাজেরা পঞ্জাবে দলীপসিংহকেই রাজা করিয়া রাখিলেন এবং কাশ্মীর রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গোলাবসিংহকে সেখানকার রাজা করিলেন।

লর্ড ডেলহাউসি।—(১৮৪৮) আবার শিখদের সহিত লড়াই বাধিল। মুলতান নগরে শিখেরা দুই জন ইংরাজকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। সেই জন্য ইংরাজেরা শিখদের আক্রমণ করিলেন। চিলিয়ানবালা নামক স্থানে শিখদের সহিত ইংরাজদের ভয়ানক সমর হইল। এ যুদ্ধে কোন পক্ষেরই হারি জিত হইল না। তাহার পর আর এক রণে শিখেরা হারিয়া গেল ও তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। ইংরাজেরা পঞ্জাব কাড়িয়া লইলেন। দলীপসিংহকে তাঁহারা বৎসরে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইলেন এবং ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সম্প্রতি তিনি ফরাসী রাজ্যে রহিয়াছেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ কেবল আমোদ প্রমোদ লইয়াই মাতিয়া থাকিতেন, প্রজাদের ভাল মন্দ মোটেই দেখিতেন না। এই জন্য তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন ও তাঁহার খরচের জন্য অনেক টাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

তিনি কালকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপে ডেলহাউসি এদেশের অনেক স্বাধীন রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে এদেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের আরম্ভ হইয়াছিল।

লর্ড ক্যানিং।—(১৮৫৬) এই গবর্ণর জেনেরলের শাসনকালে এদেশে এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহার নাম 'মিউটিনি' অর্থাৎ বিদ্রোহ। অনেকগুলি কারণে এই মিউটিনি ঘটিয়াছিল; তাহার মধ্যে প্রধান কারণ চর্ব্বি দেওয়া টোটা। সৈন্যদিগকে দাঁতে টোটা কাটিয়া সেই টোটা দিয়া বন্দুক পুরিতে হয়। ইংরাজদের অধীনে যে সকল সিপাহী, অর্থাৎ এদেশীয় সৈন্য, ছিল তাহারা মনে করিল যে, টোটায় গরু ও শূকরের চর্ব্বি দেওয়া থাকে; সেই টোটা দাঁতে কাটাইয়া ইংরাজেরা তাহাদের জাতি মারিতেছে ও তাহাদের খৃষ্টান করিবার ফিকির করিতেছে। সে সময়ে টোটায় চর্ব্বি দেওয়া হইত সত্য; কিন্তু সে চর্ব্বি দেওয়া টোটা তখনও সিপাহিদিগের হাতে দেওয়া হয় নাই। তাহা বলিলে কি হয়, তাহারা ধর্ম্মের ভয়ে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং প্রথমে বারাকপুর নামক স্থানের সিপাহিরা গোল বাধাইয়া তুলিল; ক্রমে সেই গোল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দিল্লীর নিকটে মীরট নামক সহরে বিস্তর ইংরাজ সৈন্য ও অনেক সিপাহি থাকিত। সেই

সিপাহিরা ক্ষেপিয়া মীরট পোড়াইয়া ছারখার করিল, যত পারিল ইংরাজ মারিল এবং অনেক লুঠপাট করিল। তাহার পর তাহারা দিল্লী চলিয়া গেল এবং সেখান হইতে ইংরাজদের তাড়াইয়া দিল। অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ নগরেও বিলক্ষণ মারামারি হইল। স্যর হেন্‌রি লরেন্স নামে এক জন বড় ইংরাজ ও অন্যান্য অনেক লোক মারা পড়িলেন। কানপুর সহরে সব চেয়ে ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। কানপুরের নিকট বিথুরে বাজী রাও পেশবা বাস করিতেন, এ কথা তোমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছ। তাঁহার নানা সাহেব নামে এক জন আশ্রিত লোক ছিলেন, কেহ কেহ বলে নানা সাহেব পেশবার পোষ্য পুত্র ছিলেন। পেশবার খরচের জন্য ইংরাজরা যে আট লক্ষ টাকা দিতেন, তিনি মরিয়া গেলে নানা সাহেব তাহা পাইবার জন্য দাবি করিলেন, কিন্তু ইংরাজেরা তাহা দিলেন না। এজন্য ইংরাজদের উপর নানার বড় রাগ ছিল। নানা সাহেব এক্ষণে কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহিদের সহিত মিশিয়া ও তাহাদের কর্ত্তা হইয়া সেখানকার, স্ত্রীপুরুষ ছেলেবুড়ো সমস্ত ইংরাজকে মারিয়া ফেলিলেন। এই অত্যাচারের শোধ তুলিবার জন্য ইংরাজগণ ছটফট করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিয়া কানপুর দখল করিলেন। তাহার পর অতি দক্ষতার সহিত দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহ থামাইয়া ফেলিলেন। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া অনেক নিষ্ঠুরতা

করিয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু ইংরাজেরাও বড় কসুর করিলেন না। তাঁহারও মানুষ কাটিতে, ফাঁসী দিতে ও ঘর জ্বালাইতে কম করেন নাই। যদি এ সময়ে সদাশয় লর্ড ক্যানিং গবর্ণর জেনেরল না থাকিতেন এবং যদি তিনি জোর করিয়া ইংরাজদের থামাইয়া না দিতেন তাহা হইলে তাঁহারা আরও কত অত্যাচার করিতেন কে বলিতে পারে? যাহা হউক, সিপাহী-বিদ্রোহে ইংলণ্ডের ইংরাজগণ বড় দুঃখিত হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন যে কোম্পানির দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন ভাল চলিতেছে না। এই জন্য সেই অবধি ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষ নিজের অধীন করিয়া লইলেন এবং তাহার পর হইতে যাঁহারা গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিতে লাগিলেন তাঁহারা মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন (১৮৫৮)।

মহারাণীর রাজ্য।

লর্ড এল্‌গিন্‌।—(১৮৬২) কোম্পানির মুলুক ঘুচিয়া যাওয়ার পর, লর্ড ক্যানিং চলিয়া গেলে, ইনি গবর্ণর জেনেরল ও মহারাণীর প্রতিনিধি হইয়া আসিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে আসার কিছু দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

স্যার জন্‌ লরেন্স।—(১৮৬৪) যাহা হইবার নহে

তাহাও ইঁহার কপালে ঘটিল। ইনি এ দেশে যে পদে কাজ করিতেন তাহা হইতে কখন গবর্ণর জেনেরল হওয়া যায় না। কিন্তু, সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি বড় দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহাকে এত বড় কর্ম্ম দেওয়া হইল। এই সময়ে ভুটান রাজ্যের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয় এবং তাহার অনেক স্থান তাঁহাদের লাভ হয়।



রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

লর্ড মেয়ো।—(১৮৬৯) যাহারা বড় অন্যায় কার্য্য করে বিচারের পর তাহাদের দ্বীপান্তরে পাঠান হয়, এ কথা তোমরা জান বোধ হয়। আন্দামান নামক দ্বীপ

এইরূপ অপরাধীদিগকে রাখিবার একটী স্থান। লর্ড মেয়ো একবার আন্দামান দ্বীপে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এক জন দ্বীপান্তরবাসী মুসলমান সেই সময়ে বিনা দোষে, লর্ড মেয়োর বুকে ছোরা মারিয়া, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল; ইহাতে এদেশের সকল লোকেই বড় দুঃখিত হইয়াছিল। ইহাঁর সময়ে মহারাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবরা এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

লর্ড নর্থব্রুক।—(১৮৭২) এই সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বড় ছেলে এলবার্ট এড্ওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ আমাদের দেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। অতিশয় আনন্দের সহিত ও যথেষ্ট সমারোহ করিয়া এ দেশের লোক তাঁহাকে আদর করিয়াছিল। বরদার রাজা গাইকবারের হাত হইতে তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইয়া লর্ড নর্থব্রুক সেই বংশের আর এক জনকে রাজা করিয়াছিলেন। ইহাতে এদেশের অনেক লোক বড় দুঃখিত হইয়াছিল।

লর্ড লিটন।—(১৮৭৬) এই গবর্ণর জেনেরলের সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজরাজেশ্বরী এই উপাধি গ্রহণ করেন (১৮৭৭)। সেই কথা প্রচার করিবার জন্য দিল্লী নগরে এক অতি বড় দরবার হয় এবং ভারতের নগরে নগরে ভারী সমারোহ হয়। লর্ড লিটন এদেশের লোকদের বড় অবিশ্বাস করিতেন, এজন্য তাঁহার শাসন সময়ে লোকেরা সুখী ছিল না।

লর্ড রিপন্ ।—(১৮৮০) যাহাতে এদেশের লোকদের সুবিধা ও উন্নতি হয় তিনি তাহার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; এজন্য এদেশের লোকেরা তাঁহাকে বড় ভাল বাসে। তিনি যখন এদেশ হইতে চলিয়া যান, তখন লোকেরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি দেখাইয়া বিদায় করিয়াছিল।

লর্ড ডফরিণ।—(১৮৮৪) এখন ইনিই আমাদের দেশের গবর্ণর জেনেরল। ইনি সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের রাজার হাত হইতে ব্রহ্মরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন, এবং সেখানকার রাজা ও রাণীকে ভারতবর্ষে আনিয়া রাখিয়াছেন। সেখানকার প্রজারা এখনও সম্পূর্ণরূপ অধীন হয় নাই। আচ্ছা বল দেখি, এই গবর্ণর জেনেরলের সময়ে প্রধান ঘটনা কি? মহারাণী ভিক্টোরিয়া পঞ্চাশ বৎসর সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন। গত বৎসরে (১৮৮৭) সেই পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ হওয়ায় যে উৎসব হইয়াছিল তাহার ইংরাজি নাম জুবিলি। জুবিলির কথা তোমাদের সকলেরই মনে আছে সন্দেহ নাই। এখন বল, তোমাদের যেখানে বাড়ী জুবিলিতে সেখানে কিরূপ ঘটা হইয়াছিল ও সে সময়ে তোমাদের পাঠশালার কয়দিন ছুটী হইয়াছিল।

সমাপ্ত।